بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

সংখ্যা
12-13

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 23-30 শে মার্চ, 2017 23-30 আমান,1396 হিজরী শামসী ২৩ জামাদিয়উস সানি-১ রজব 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমাদের খোদা সেই খোদা- যিনি এখনো জীবিত আছেন যেভাবে পূর্বে জীবিত ছিলেন। এখনো তিনি কথা বলেন যেভাবে পূর্বে কথা বলতেন; এবং এখনো শুনেন যেমন পূর্বে শুনতেন। এযুগে তিনি শুনেন কিন্তু কথা বলেন না এটা অলীক ধারণা। বস্তুত তিনি শুনেন এবং কথাও বলেন। যাঁর সব গুণাবলী অনাদি ও চিরস্থায়ী। তাঁর কোন গুণই নিষ্ক্রিয় নয় এবং এরূপ কখনো হবে না।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

হে শ্রোতাগণ! শোন খোদা তোমাদের কাছে কী চান? শুধু এটাই যে, তোমরা তাঁরই হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; আকাশেও না, ভূ-পৃষ্ঠেও না। আমাদের খোদা সেই খোদা- যিনি এখনো জীবিত আছেন যেভাবে পূর্বে জীবিত ছিলেন, এখনো তিনি কথা বলেন যেভাবে পূর্বে কথা বলতেন; এবং এখনো শুনেন যেমন পূর্বে শুনতেন। এযুগে তিনি শুনেন কিন্তু কথা বলেন না এটা অলীক ধারণা। বস্তুত তিনি শুনেন এবং কথাও বলেন। যাঁর সব গুণাবলী অনাদি ও চিরস্থায়ী। তাঁর কোন গুণই নিষ্ক্রিয় নয় এবং এরূপ কখনো হবে না। তিনি সেই ওয়াহেদ, লা-শরীক খোদা। যাঁর কোন পুত্র নেই এবং যাঁর কোন স্ত্রীও নেই। তিনি সেই অনুপম খোদা, যাঁর সদৃশ দ্বিতীয় কেউ নেই এবং যাঁর ন্যায় কেউই কোন বিশেষ গুণে গুণান্বিত নয়। তাঁর তূল্য কেউ নেই, তাঁর সমগুণসম্পন্ন কেউ নেই এবং তাঁর কোন শক্তি লয়শীল নয়। তিনি দূরে থেকেও নিকটে এবং নিকটে থেকেও দূরে। তিনি রূপকভাবে আহলে কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শী) এর নিকট আত্মপ্রকাশ করতে পারেন; কিন্তু তাঁর কোন শরীক নেই, না কোন আকার আছে। তিনি সবার উপরে কিন্তু এটা বলতে পারবো না তাঁর নীচে অন্য কেউ রয়েছে। তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু একথা বলতে পারবো না যে, তিনি পৃথিবীতে নেই। তিনি পূর্ণ গুণাবলীর আধার এবং সত্যিকার প্রশংসার সমাহার বা প্রকাশক। তিনি সব সৌন্দর্যের উৎস এবং তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সব কল্যাণের প্রস্রবণ, প্রত্যেক বস্তুর আশ্রয়স্থল এবং তিনি প্রত্যেক রাজ্যের অধিশ্বর, প্রত্যেক চরম উৎকর্ষের অধিকারী এবং প্রত্যেক ত্রুটি ও দুর্বলতা হতে মুক্ত। পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসী তাঁরই ইবাদত ও উপাসনা করবে।.....তিনি নিজ শক্তি, মহিমা ও নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন এবং তাঁকে তাঁরই সাহায্যে আমরা লাভ করতে পারি। তিনি সব সময় সাধুদের কাছে নিজ অস্তিত্ব প্রকাশ করে থাকেন এবং নিজ শক্তি ও মহিমা তাদেরকে প্রদর্শন করেন। এ থেকেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় এবং এর মাধ্যমেই তাঁর মনোনীত পথের পরিচয় লাভ করা যায়।

তিনি জড় চোখ ছাড়া দেখেন, জড় কান ছাড়া শোনেন এবং জড় জিহ্বা ছাড়া কথা বলেন। এভাবে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনা তাঁর কাজ। যেমন তোমরা দেখতে পাও যে, স্বপ্নের দৃশ্যাবলীতে কোন উপাদান ছাড়া তিনি এক জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন এবং প্রত্যেক লয়শীল ও অস্তিত্বহীনকে বাস্তবাকারে প্রদর্শন করেন। বস্তুত এভাবেই সব কুদরত (ক্ষমতা) বিরাজিত। যে তার কুদরত অস্বীকার করে যে মুর্খ। সেই ব্যক্তি অন্ধ যে তাঁর গভীর শক্তিসমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যেসব কাজ তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বা তাঁর প্রতিশ্রুতি বিরুদ্ধ, এগুলো ছাড়া বাকী সবই তিনি করেন এবং করতে সক্ষম। তিনি নিজ সত্তায়, গুণে, কাজে ও শক্তিতে অদ্বিতীয় এবং তাঁর কাছে পৌঁছাবার জন্য একটি ভিন্ন অন্য সব দুয়ারই বন্ধ। এ দুয়ার কুরআন মজীদ উদ্ঘাটন করেছে। পূর্বের সব নবুয়ত ও সব ধর্মগ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে অনুসরণ করার আর কোন প্রয়োজন নেই কেননা মুহাম্মদী নবুয়ত এদের সবগুলিকে আত্মস্থ এবং পরিবেষ্টন করে আছে। এছাড়া সব পথই বন্ধ। খোদা পর্যন্ত পৌঁছায় এমন সব সত্য এতেই নিহিত রয়েছে। এরপর আর কোন নতুন সত্য আসবে না এবং ইতোপূর্বে এমন কোন সত্য ছিল না যা এতে উল্লেখিত নেই। এই নবুয়তের মাঝে সব নবুয়ত শেষ হয়েছে এবং এটাই হবার ছিল। কারণ যে জিনিসের সূচনা আছে তার জন্য সমাপ্তিও আছে। কিন্তু এ মুহাম্মদী নবুওয়ত নিজ আশিস বিতরণে অসমর্থ নয় বরং সব নবুওয়ত অপেক্ষা এতে অধিক আশিস রয়েছে। এ নবুয়তের অনুসরণ খুব সহজে খোদা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং এর অনুবর্তিতায় খোদা তা'লার প্রেম ও তাঁর বাক্যালাপের পুরস্কার পূর্বাপেক্ষা অধিকহারে লাভ করা যায়।

(আল-ওসীয়্যত)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জাতিসমূহের মধ্যে সুবিচারপূর্ণ সম্পর্কই প্রকৃত শান্তির পথ

[সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ]

ক্যাপিটাল হিল, ওয়াশিংটন ডি.সি., যুক্তরাষ্ট্র, ২০১২

পটভূমি

২৭ শে জুন, ২০১২ ওয়াশিংটন ডি.সি.-র ক্যাপিটাল হিল (সংসদ ভবন)-এ মসীহ মওউদ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা ও আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর, রাষ্ট্রদূত, হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা, এন.জি.ও নেতা, ধর্মীয় নেতা, অধ্যাপক, নীতি নির্ধারক, আমলা, কূটনীতিবিদ, বিভিন্ন থিংক ট্যাংক ও পেন্টাগণ-এর প্রতিনিধি এবং মিডিয়ার পক্ষ থেকে উপস্থিত সাংবাদিকগণ-এর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। অভূতপূর্ব এ সভাটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতাদের কয়েকজন, যাদের মধ্যে রয়েছেন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ্স-এর ডেমোক্র্যাটিক দলের নেতা অনারেবল ন্যান্সী পেলোসি, এর জন্য বিশ্ব শান্তি সম্পর্কে ইসলামের বাণী সরাসরি শোনার সুযোগ করে দেয়। অনুষ্ঠানের পর হুযুর (আই.)-কে ক্যাপিটাল হিল (সংসদ) ভবন ঘুরিয়ে দেখানো হয়, এরপর তাঁকে সম্মানের সাথে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ্স-এ নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাঁর এ যুক্তরাষ্ট্র সফরের সম্মানে একটি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ- আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক।

আপনারা সময় বের করে আমার বক্তব্য শুনতে এসেছেন- তাই প্রথমেই আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাকে এমন একটি বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে যা অত্যন্ত ব্যাপক। এর বহুবিধ দিক রয়েছে। তাই আমার পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বিষয়টির খুঁটিনাটি তুলে ধরা সম্ভব নয়। আর যে বিষয়ে আমাকে বলতে বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়'। আজকের পৃথিবীর জন্য নিঃসন্দেহে এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য একটি বিষয়। সময়ের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি " জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পারস্পরিক সুসম্পর্ক রচনায় ইসলামী শিক্ষা' -এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য তুলে ধরব।

প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্জিত পারে না। আর এই নীতিটি জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই অনুধাবন করেন। নৈরাজ্য সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর কিছু মানুষ ছাড়া কেউ একথা দাবী করে বলতে পারে না, অমুক সমাজে বা দেশে অথবা গোটা পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্বেও সেখানে অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করছে। এতদত্বেও, আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির রাজত্ব বিরাজ করতে দেখছি। বিভিন্ন দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এমন নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে তাদের নীতি নির্ধারণের দাবী থাকা সত্বেও এই বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ বিদ্যমান। অথচ সবাই দাবী করে বলে, শান্তি প্রতিষ্ঠাই হল তাদের মূল লক্ষ্য! কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিতে, বিশ্বে যে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে আর এর ফলে যে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ছে- এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। তাই যেখানে বা যখনই বৈষম্য চোখে পড়ে তা দূর করা এবং এ উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করা একান্ত অপরিহার্য। আর তাই নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হিসেবে, ন্যায়ের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা ও শান্তি অর্জনের উপায় সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পূর্ণভাবে একটি ধর্মীয় সংগঠন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল, যে মসীহ ও এবং সংস্কারকের এ যুগে আবির্ভাবের ও বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত করার কথা ছিল, তিনি সত্যিই এসে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও সংস্কারক। আর এ কারণে আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি। আমরা তাঁর শিক্ষার আলোকে পবিত্র কুরআনের অনুশাসন মেনে চলি আর ইসলামের সেই প্রকৃত ও খাঁটি শিক্ষার প্রচার করি যার ভিত্তি হল পবিত্র কুরআন। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে আমি যা বলব তা হবে কুরআনের শিক্ষার আলোকে।

বিশ্বে শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে আপনারা সকলে নিয়মিতভাবে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন এবং নিঃসন্দেহে অনেক উদ্যোগও নেন। আপনাদের সৃজনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত মন-মানসিকতা আপনাদেরকে মহৎ ধ্যান-ধারণা, পরিকল্পনা এবং শান্তি স্থাপনের বিভিন্ন রূপরেখা উপস্থাপনে সহায়তা করে। তাই এ বিষয়ে জাগতিক বা রাজনৈতিক আঙ্গিকে আমার বলার প্রয়োজন নেই, বরং ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাই হবে আমার আলোচনা মূল বিষয়বস্তু। আর আগেই বলেছি, এ উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক-নির্দেশিকা উপস্থাপন করব।

একথা সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, মানবীয় জ্ঞান ও মেধা ত্রুটিমুক্ত নয়, বরং এর মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা নির্ধারণের সময়, প্রায়শই নির্দিষ্ট কিছু বিষয় মানব হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে বিচার ক্ষমতাকে কলুষিত করে দিতে পারে এবং এর পরিণতিতে মানুষ তার ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে লিপ্তও হতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি অন্যায় ফলাফল নির্ধারণ ও অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইন নিখুঁত; হীন স্বার্থসিদ্ধি বা অন্যায্য কোন উপকরণই এতে থাকে না। এর কারণ হল, আল্লাহ, তাঁর সৃষ্টির জন্য কেবল মঙ্গলই কামনা করে থাকেন আর তাই তাঁর আইন হল সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য। পৃথিবীর মানুষ যেদিন এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, সেদিন প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তির ভিত রচিত হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে, কয়েকটি দেশের নেতারা ভবিষ্যতে বিশ্বের সকল জাতির মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আকাঙ্খা পোষণ করেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে 'লীগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্ব জুড়ে শান্তি বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধ প্রতিহত করা। দুঃখজনকভাবে, এর সংবিধান ও প্রস্তাবাবলীতে এমন কিছু ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল যা সমভাবে সকল মানুষ ও সকল জাতির অধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেই অনেক দেশ একের পর এক ' লীগ' থেকে সরে পড়তে আরম্ভ করে। এতে বিরজমান সেই অসাম্যের কারণে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি অর্জন সম্ভব হয় নি। 'লীগের' প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এ পৃথিবীকে সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বের মুখে ঠেলে দেয়। আমরা সবাই এই বিশ্ব যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত। এতে বিশ্বজুড়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, যাদের অনেকেই ছিল বেসামরিক নিরীহ জনাসাধারণ।

এই যুদ্ধ বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল। এটি ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সকল পক্ষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করে এমন বিচক্ষণ নীতি নির্ধারণের উপলক্ষ হওয়া উচিত ছিল যা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি উপকরণ সাব্যস্ত হতে পারত। তৎকালীন বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্যোগ নেয় আর এভাবে 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে কিন্তু অচিরেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল তা আজও অর্জিত হয় নি। ইদানিং কয়েকটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অকপট বিবৃতি নিঃসন্দেহে এর ব্যর্থতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে।

প্রশ্ন হল, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে আর শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলামের ভাষ্য কি? পবিত্র কুরআনের ৪৯ নম্বর সূরার ১৪ নম্বর আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, মানুষে মানুষে জাতিগত ভিন্নত বা কৃষ্টিগত পার্থক্য আমাদের পরিচিতির একটি মাধ্যম মাত্র, কিন্তু এটি কারও উপর অন্য কারও শ্রেষ্ঠত্ব কোনভাবেই সাব্যস্ত বা প্রদান করে না। কুরআন করীম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, সকল মানুষ জন্মগতভাবে সমান। উপরন্তু, মহানবী হযরত মহম্মদ (সা.) তাঁর শেষ ভাষণে সকল মুসলমানকে চিরকাল একথা স্মরণ রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, একজন আরববাসী একজন অনারবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়, আবার একজন অনরাবও একজন আরবের উপর কোন ধরণের শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। তিনি আরও বলেছেন, একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ একজন কৃষ্ণাঙ্গের তুলনায় কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিও একজন শ্বেতাঙ্গের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। অতএব সকল জাতি ও সকল বর্ণের মানুষ সমান-এটিই ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা । আর একথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সকল মানুষকে বৈষম্য ও পক্ষপাতহীনভাবে সম অধিকার প্রদান করা উচিত। এটিই হচ্ছে বিভিন্ন দল ও জাতির মাঝে সম্প্রীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল পন্থা ও অপরিহার্য সূত্র।

কিন্তু আজ আমরা শক্তিশালী এবং দুর্বল জাতিসমূহের মাঝে পরস্পর বিভেদ ও বৈষম্য দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমরা বৈষম্য লক্ষ্য করি। অনরূপভাবে, নিরাপত্তা পরিষদে কিছু 'স্থায়ী' সদস্য

এরপর বারোর পাতায়....

জুমআর খুতবা

২০ ফেব্রুয়ারি দিনটি জামা'তে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সুপরিচিত।

এটি একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক মহান সন্তানের শুভ-সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যার বহু বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যার দীর্ঘজীবি হওয়ার সংবাদও রয়েছে। মুসলেহ্ মওউদ-এর যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তের অসাধারণ উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল। আর জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ৫২ বছর দীর্ঘ খিলাফতকালে এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। একজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির জন্য এবং আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির জন্য শুধু এই একটি ভবিষ্যদ্বাণীই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার অনেক বড় প্রমাণ হতে পারে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্যের আত্মা লাভের ভিত্তিতে পূর্ণতা লাভ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতির আলোকে ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা।

আগামী দিনগুলোতে জামা'তে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে জলসা হবে

জামা'তের সদস্যদের তাতে বেশি বেশি যোগদান করা উচিত, শোনা উচিত, যেনভবিষ্যদ্বাণীর গভীর জ্ঞান লাভ হয়। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বহু নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে এবং সেগুলি মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর সত্তায় বড় মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত** ১৭ ই ফেব্রুয়ারী , ২০১৭, **এর জুমুআর খুতবা (১৭ তবলীগ, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,যেভাবে আমরা জানি যে, ২০ ফেব্রুয়ারির দিনটি জামা'তে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সুপরিচিত। এটি একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক মহান সন্তানের শুভ-সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যার বহু বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যার দীর্ঘজীবি হওয়ার সংবাদও রয়েছে। মুসলেহ্ মওউদ-এর যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তের অসাধারণ উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল। আর জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ৫২ বছর দীর্ঘ খিলাফতকালে এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। একজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির জন্য এবং আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির জন্য শুধু এই একটি ভবিষ্যদ্বাণীই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার অনেক বড় প্রমাণ হতে পারে।

তিনদিন পর ২০ ফেব্রুয়ারি আসতে যাচ্ছে। আজ আমি এ প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নিজের ভাষায় বর্ণিত কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যা সত্যের আত্মা লাভের ভিত্তিতে এ ভবিষ্যদ্বাণী যে তাঁর সত্তায় পূর্ণ হয়েছে, সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে ১৯১৪ সনে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সত্তায় মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি কথার পূর্ণতা তখনকার মানুষের চোখে পড়ত। আর জামা'তের আলেম ও সাধারণ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী এটিই বুঝত যে, তিনিই মুসলেহ্ মওউদ। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) স্বয়ং কখনো এটি ঘোষণা করেন নি; এভাবে ১৯৪৪ সাল চলে আসে অর্থাৎ তাঁর খিলাফতের ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর তিনি তাঁর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে ঘোষণা করেন যে, 'আমি-ই মুসলেহ্ মওউদ' অর্থাৎ, প্রতিশ্রুত সংস্কারক। একই সাথে তিনি এটিও বলেছেন যে, 'আমার যা স্বভাব বা প্রকৃতি, সে দিক থেকে আমার জন্য এই ঘোষণা করা আর সেই সাথে স্বপ্নের বিশদ বিবরণও তুলে ধরা অত্যন্ত কঠিন কাজ।' বরং কয়েক স্থানে তিনি এ-ও বলেছেন, 'স্ব ভাব ও প্র কৃতির দিক থেকে আমি আমার স্বপ্ন এবং ইলহাম বলতে দ্বিধা বোধ করি। কিন্তু কোন কোন পরিস্থিতিতে কিছু ইলহাম বলতেও হয়।' যাহোক, পূর্বেও জামা'তের সদস্য এবং আলেমদের পক্ষ থেকে বলা হতো যে, আপনি ঘোষণা দিন যে আপনিই মুসলেহ্ মওউদ। কিন্তু তিনি শুধু এ উত্তরই প্রদান করতেন যে, 'ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমিই যদি মুসলেহ্ মওউদ হয়ে থাকি আর মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী আমার সত্তায় পূর্ণতা লাভ করে, তাহলে দাবির তো কোন প্রয়োজন নেই।' মানুষের কথার উত্তর দিতে গিয়ে একবার তিনি এটিও বলেছেন, 'উম্মতে মুসলেমায় মুজাদ্দেদের যে তালিকা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখানোর পর ছাপানো হয়েছে, তাদের মাঝে কয়জন এমন আছেন যারা দাবি করেছেন?' তিনি বলেন, "আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এটি বলতে শুনেছি যে, 'আমার কাছে তো আওরঙ্গজেবকেও তার যুগের মুজাদ্দেদ মনে হয়।' কিন্তু তিনি কি কখনো দাবি করেছেন? উমর বিন আব্দুল আযীযকে মুজাদ্দেদ বলা হয়, তার কি এমন কোন দাবি রয়েছে?"তিনি (রা.) বলেন, 'অতএব, যারা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নন, তাদের জন্য দাবি করা আবশ্যক নয়। শুধু প্রত্যাদিষ্টদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে দাবি করা আবশ্যক। যারা প্রত্যাদিষ্ট নয়, তাদের কাজের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। যদি কাজের পূর্ণতা লাভ করতে দেখা যায়, তবে তার দাবির প্রয়োজন কী? এমন ক্ষেত্রে সে যদি অস্বীকারও করে, তবুও আমরা বলব যে, তিনিই এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতারস্থল। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয মুজাদ্দেদ হওয়ার কথা অস্বীকার করলেও আমরা বলতে পারতাম যে, তিনি স্বীয় যুগের মুজাদ্দেদ। কেননা, মুজাদ্দেদের জন্য কোন দাবি করার প্রয়োজন নেই। দাবি করা শুধু সেসব মুজাদ্দেদের জন্য আবশ্যক, যারা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট। অবশ্য প্রত্যাদিষ্ট নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের নির্দেশাবলীকে দাঁড় করায়, শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করে, এমন ক্ষেত্রে তার যদি এটি জানা না-ও থাকে যে তিনি মুজাদ্দেদ, তারপরও আমরা বলতে পারি যে তিনি মুজাদ্দেদ। হ্যাঁ, প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দেদ কেবল তিনিই হতে পারেন যিনি দাবি করেন; যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করেছেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, অতএব, আমার পক্ষ থেকে মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করার কোন প্রয়োজন নেই। আর বিরোধীদের এমন কথায় আমাদের বিচলিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। এতে অসম্মানের কিছু নেই; প্রকৃত সম্মান সেটিই, যেটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ হয়ে থাকে। এ পৃথিবীর দৃষ্টিতে মানুষ হীন বলে গণ্য হলেও যদি সে খোদা তা'লার শিক্ষানুসারে জীবন যাপন করে, তাহলে খোদার দরবারে সে অবশ্যই সম্মানিত হবে। আর কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যা বলে নিজের ভ্রান্ত দাবিকে প্রতিষ্ঠিতও করে ফেলে এবং নিজের ধূর্ততা ও চালাকির মাধ্যমে মানুষের মাঝে প্রাধান্যও বিস্তার করে, তবুও সে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সম্মান পেতে পারে না। আর যে খোদার সন্নিধানে সম্মানিত নয়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে যতই সম্মানিত হোক না কেন, সে কিছু একটা হারিয়েছেই, অর্জন সে করে নি।

তিনি বলেন- আর অবশেষে সে একদিন অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে। অতএব, ধর্মীয় এবং জাগতিক কাজে সর্বদা সত্যকে অবলম্বন কর।' তিনি (রা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর খাতিরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে সত্যিকার অর্থে

কল্যাণের মাঝেই থাকে।' এ প্রেক্ষাপটে একটি নীতিগত কথাও তিনি বর্ণনা করেছেন আর তা হল– যে সত্যের সাথে খোদা আছেন, যাকে আল্লাহ্ সত্য মনে করেন এবং খোদার ব্যবহারিক সাক্ষ্যের মাধ্যমেও তা প্রমাণিত হয়, তার জন্য দাবি করা বা ঘোষণা করা আবশ্যক নয়। হ্যাঁ, যদি খোদা তা'লা চান যেঘোষণা করা হোক, তবে ঘোষণাও করা হয়ে থাকে। কাজেই, কাউকে যদি যাচাই করতে হয় যে তিনি খোদার ইচ্ছার অধিনে কাজ করছেন কি-না বা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত কি-না, অর্থাৎ ধর্মের কাজের ক্ষেত্রে, তাহলে তা ঐশী সর্মথনের প্রেক্ষাপটে যাচাই করা উচিত। কিন্তু আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি, আল্লাহ্ তা'লা যখন তাকে বলেন যে 'তুমি দাবি কর', তখন তিনি ঘোষণাও করেছেন যে 'আল্লাহ্ তা'লা আমার সামনে স্পষ্ট করেছেন, তাই আমি এখন ঘোষণা করছি যে আমি-ই মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণস্থল।' এই ঘোষণার পর একদিকে যেমন জামা'তের সদস্যরা আনন্দিত ছিল, অন্যদিকে লাহোরী বা গায়ের মোবাঈন যারা ছিল, তারা আপত্তি করা শুরু করে দেয়। অতঃপর ১৯৪৫ সনের জলসা সালানার ২য় দিন ২৭ তারিখের বক্তৃতায় এর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বিশেষভাবে মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবের আপত্তির প্রসঙ্গে কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, "আমি যখন থেকে মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছি, তখন থেকেই মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব আপত্তি করা আরম্ভ করে দেন, যেভাবে মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেব করতেন। আমি স্বপ্ন বা ইলহাম শুনাই এবং আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে জ্ঞান লাভের ভিত্তিতে ঘোষণা করি, কিন্তু এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব কোন স্বপ্ন বা ইলহাম উপস্থাপন করেনও না, আর উপস্থাপন করার সামর্থ্যও তার নেই। কেননা তিনি অনেক কষ্টে-সৃষ্টে নিজের ত্রিশ বছর পুরোনো একটি ইলহাম শুনাতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু তা-ও ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয়েছে। যেহেতু ইলহাম হয়-ই নি, তো ইলহাম উপস্থাপন করবেন কীভাবে? এখন আপত্তি ছাড়া আর কিছু তো তার কাছে নেই; আপত্তিও যদি না করেন, তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কীভাবে করবেন? হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ.) -এর শত্রুদের জন্য একথা বলা তো সম্ভব ছিল না যে ইলহাম হয়-ই না; কেননা তাঁদের পূর্বের নবীদের প্রতি ইলহাম হতো এবং তারা এ কথা মানতো, এ কারণে সেই নবীদের অস্বীকারকারীরা একথা বলতে পারতো না যে ইলহাম বলে কিছু নেই; নিজেদের কথা সঠিক প্রমাণ করতে গিয়ে আর নবীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে এটি বলতো যে, 'এদের ইলহাম সব বানানো'। অনুরূপভাবে রসূলে করীম (সা.)-এর শত্রুরাও এটিই বলেছে যে, এর ইলহাম সব বানানো। খ্রিষ্টান এবং ইহুদীদের এ কথা যদি সঠিক হতো যে মহানবী (সা.)-এর ওহী (না'ঊযুবিল্লাহ) বানানো ছিল, তাহলে এটি আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমানের দাবি ছিল যেন মহানবী (সা.)-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের প্রতি ইলহাম করা হয়, যেন মিথ্যাবাদীদের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যে তাদেরকে ইলহাম থেকে বঞ্চিত রেখেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে মহানবী (সা.)-ই সত্যের উপর ছিলেন, তাঁর শত্রু ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা ছিল অন্যায়ের উপর। অনুরূপভাবে মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব আজকে বলেন যে আমার ইলহাম মিথ্যা। কিন্তু তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের প্রতি সত্য ইলহাম করেন না, যেন পৃথিবীবাসী জানতে পারে যে মৌলভী সাহেব সত্যের উপর রয়েছেন আর আমি মিথ্যার উপর রয়েছি?"

তিনি বলেন, 'আশ্চর্যের বিষয় হল, এক ব্যক্তি দিনরাত আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে আর দিবারাত্র তাঁর বান্দাদের প্রতারণা আর ধোঁকার পথের দিকে ঠেলতে থাকে, তাসত্ত্বেও আল্লাহ্তা'লা আত্মাভিমান প্রদর্শ ন করেন না! যদি আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান জাগ্রত না হয় তাহলে তার কারণ এটি ছাড়া আর কিছু নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা জানেন– মৌলভী সাহেব তাঁর নৈকট্য থেকে অনেক দূরে রয়েছেন; সেই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ইলহাম করেন নি। অতএব সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শুরু থেকেই মানুষ সত্যকে অস্বীকার করে আসছে । আদি থেকে এই ধারা অব্যাহত আছে এবং এটি অব্যাহত থাকবে।"(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃষ্ঠা: ২৪০-২৪১) অর্থাৎ সত্যের বিরোধিতায় তাদের এই আচরণ অব্যাহত থাকবে।

অতএব আপত্তিকারীরা তো সবসময় আপত্তি করে আসছে, কিন্তু সেটিকে প্রত্যাখ্যানের জন্য তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিছু উপস্থাপন করতে পারে না, আর পারবেও না। আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষী করে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে স্বাক্ষী করে নিজেদের ইলহাম এবং স্বপ্ন উপস্থাপন করছি, এমনটি তারা বলতে পারবে না; কেননা তারা জানে যে তাহলে তারা ধরা পড়বে।

এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কিছু ইলহাম, দিব্যদর্শন এবং স্বপ্নে র কথা উল্লেখ করছি, যা মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ঘোষণা করার সময় তিনি বর্ণনা করেছিলেন।

তিনি (রা.) বলেন, "সর্ব প্রথম বিষয় যা এই পদের দিকে ইঙ্গিত করে তা হল আমার একটি ইলহাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় এটি আমার প্রতি নাযেল হয়েছে। আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গিয়ে তা অবহিত করি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর ইলহামের খাতায় তা লিপিবদ্ধ করে নেন। সেই ইলহাম আমি বারবার শুনিয়েছি (লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি এটি বলেন)। প্রথমে এটিকে আমি শুধু খিলাফত সংক্রান্ত মনে করতাম, কিন্তু এখন আমার মাথায় এসেছে যে, এই ইলহামে আমার সেই পদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার প্রাপ্ত হওয়ার ছিল। সেই ইলহাম হল: إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তোমার অনুসারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত রাখবেন। তিনি (রা.) বলেন, "এতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। খুবই সূক্ষ্ম একটি ইশারা, যা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত বহন করে। তা হল, এটি সেই ইলহাম যা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যার উল্লেখ কুরআনেআছে। কিন্তু সেখানে অর্থাৎ কুরআনে শব্দ হল وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (আলে ইমরান: ৫৬) আরএখানে ইলহাম হল, إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ এর কারণ হল, হযরত ঈসা (আ.)-এর দাবি ছিল মূসায়ী ধারার শেষ নবী হওয়ার, আর এমন দাবি সম্পর্কে পূর্ববর্তী লোকদের বিরোধিতা অবশ্যই হয়ে থাকে; এরপর এক দীর্ঘ যুগের অবসান হলে তারা সেই নবীর সত্তায় ঈমান আনে। কিন্তু মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যার সত্তায় পূর্ণ হওয়ার ছিল, তাকে যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা খলীফা বানাতে চাইতেন, আর যেহেতু যিনি খলীফা হন তিনি সাথে সাথেই এক পূর্ব গঠিত জামা'ত পেয়ে যান, সেজন্য এখানে 'জাইলুল্লযীনা' সংক্রান্ত অংশের প্রয়োজন ছিল না। হযরত মসীহ্র পদ নিয়ে যে সমস্ত নবীরা পৃথিবীতে আসেন তাদের দাবি শোনার সাথে সাথেই মানুষ 'মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী' বলা আরম্ভ করে। আবু বকরের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোন মানুষ যদি হয়, সে যদি মেনে নেয় তাহলে ভিন্ন কথা। নতুবা সচরাচর এমন নবী যখন নবী হওয়ার দাবি করেন তখন সারা পৃথিবী তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়া আরম্ভ করে। স্বয়ং রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি প্র থমদিকে শুধু তিন ব্যক্তি ঈমান এনেছিল। কিন্তু খলীফা প্রথম দিনেই একটি পূর্বগঠিত জামা'ত পেয়ে যান। অতএব إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ বলে আল্লাহ্ তা'লা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে একদিন পূর্বগঠিত জামা'ত দান করবেন, এরপর তোমার সাথে এই জামা'তের সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করবেন, আর এক পর্যায়ে রূপকভাবে তা তোমার জামা'ত আখ্যায়িত হবে। আর কিছু মানুষ তোমার বিরোধিতাও করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তোমার হাতে বয়আতকারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন, আর এই বিজয় তোমার ইমাম হওয়ার সাথে সাথেই আরম্ভ হয়ে যাবে। 'ওয়া জাইলুল্লাযীনাত্তাবাঊকা' অংশের প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ তোমার অপেক্ষা করার প্রয়োজন হবে না যে মানুষ কখন ঈমান আনবে, বা এমন হবে না যে অধিকাংশ মানুষ বিরোধিতা করবে, ফতোয়া আরোপ করবে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে, ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করবে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিরোধিতার ঝড় উঠবে ইত্যাদি; বরং আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পূর্বগঠিত জামা'তের সিংহভাগকে তোমার হাতে অর্পণ করবেন। আর যেদিন এই জামা'ত তোমার হাতে অর্পিত হবে সেদিন থেকেই তোমার মান্যকারীরা তোমার বিরোধিতাকারীদের উপর বিজয় লাভ করা আরম্ভ করবে।"

তিনি (রা.) বলেন, "দেখ, এমনই হয়েছে! হযরত ঈসা (আ.)-এর জামা'ত বিজয় লাভ করেছে তিনশত বছর পর, কিন্তু এখানে আল্লাহ্ তা'লা যখন খিলাফতের আসনে আমাকে আসীন করেছেন তার কয়েক সপ্তাহের ভিতরই যারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হয়েছিল আর আমার পদের অস্বীকারকারী ছিল অর্থাৎ লাহোরী, খোদা তাদের বিরুদ্ধে আমাকে এবং আমার সাথীদের বিজয় প্রদান করা আরম্ভ করেন। আর বিজয় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিদিন প্রতিনিয়ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। লাহোরীরা আজকে বলছে যে, একটা স্বপ্নের উপর নির্ভর করা হয়েছে।" অর্থাৎ সেই স্বপ্ন যার ভিত্তিতে তিনি (রা.)

মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার ঘোষণা করেছেন। তারা বলে যে এক স্বপ্নের ভিত্তিতে এই ঘোষণা করা হচ্ছে যে তিনি মুসলেহ্ মওউদ। তিনি (রা.) বলেন, "অথচ সেটিও স্বপ্ন নয়, কেননা তাতে নির্দিষ্ট শব্দমালা ছিল। কিন্তু উপরে আমি যে ইলহাম লিখেছি তা তো ইলহাম, আর তা চল্লিশ বছর আগের। আল্লাহ্ তা'লা সংবাদ দিয়েছেন যে আমি এক জামা'তের ইমাম নিযুক্ত হব, কিছু মানুষ আমার বিরোধিতা করবে আর অধিকাংশ আমার সমর্থনে দণ্ডায়মান হবে, যারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা অন্যদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন। এই যে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তা'লা তোমার মান্যকারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করবেন– এতে এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে আল্লাহ্ তা'লা একদিন আমাকে রূপকভাবে নবীদের অর্থাৎ মূসায়ী ঈসা এবং মুহাম্মদী ঈসার নাম দিতে যাচ্ছেন; কেননা খলীফার জামা'ত তার জীবদ্দশা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, কেবলমাত্র নবী বা যিল্লী (ছায়া) নবীদের মৃত্যুর পরও জামা'ত চলতে থাকে। কাফারু-তেও এদিকে ইঙ্গিত আছে যে খিলাফতের পর আমি আরেকটি পদমর্যাদা লাভ করব, তা হল কতক নবীর প্রতিচ্ছবি হওয়ার মর্যাদা। سُبْحَانَ اللّٰهِ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ

(খুতবাতে মাহমুদ, ২৫ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৭-৮৯)

পুনরায় তিনি বলেন, "দ্বিতীয়ত আমার প্রতি কাশফ (দিব্যদর্শন) হয়েছে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় আমি দেখেছিলাম, তা-ও এ পদের দিকে ইঙ্গিত করে। আমি দেখলাম যে আমি সেই কক্ষ থেকে বের হচ্ছি যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বসবাস করতেন। বাইরে উঠানে এসেছি, সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বসে আছেন। তখন কোন ব্যক্তি এই কথা বলে আমাকে একটা পার্সেল দিয়ে গেছে যে, 'এর কিছু তোমার জন্য আর কিছু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য।' কাশফে যখন আমি সেই পার্সেলে লেখা ঠিকানা দেখি তাতে দু'টি নাম লেখা দেখতে পাই। আর ঠিকানা এভাবে লেখা ছিল যে প্রাপক মুহীউদ্দীন এবং মুঈনুদ্দীন।" তিনি বলেন, "কাশফে আমার এই উপলব্ধি হয় যে এগুলোর একটি নাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আর দ্বিতীয় নাম আমার। তখন যেহেতু আমি বালক ছিলাম তাই হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর নাম আমি শুনিনি। শুধু আওরঙ্গজেব সম্পর্কে আমি জানতাম যে তার নাম ছিল মুহীউদ্দীন। তাই আমার উপলব্ধি হল যে মুহীউদ্দীন বলতে আমাকে বুঝানো হয়েছে। আর হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী নামে যেহেতু ভারতে এক প্রসিদ্ধ বুযুর্গ গত হয়েছেন, তাই আমি ধরে নিয়েছি যে মুঈনুদ্দীন বলতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু পরে আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী সাহেব অনেক বড় এক বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন। আমি বুঝলাম যে মুহীউদ্দীন দ্বারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে, যিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করেছেন; আর মুঈনুদ্দীন হলাম আমি, যে ধর্মের সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়েছে। অতএব, ধর্মের সঞ্জীবনকারী হলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর ধর্মের সাহায্য এবং সমর্থনকারী আমি। যেভাবে মা বাচ্চা প্রসব করেন আর দাঈমা দুধ পান করায়।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ২৫ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৯-৯০)

পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, "তৃতীয় ইলহাম যা এই প্রসঙ্গে আমার প্রতি হয়েছে, কিন্তু তা হয়েছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর, তা হল- اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا (সাবা: ১৪) 'হে দাউদের বংশধর! আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চল'। এই ইলহামে 'ই'মালু' বলে খোদা তা'লা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশ পুরোপুরি মান্য করার নির্দেশ দিয়েছেন আর আলে দাউদ বা দাউদের বংশধর বলে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে তুলনা করেছেন। হযরত সুলায়মান (আ.) হযরত দাউদের পর খলীফা হয়েছিলেন আর একই সাথে তাঁর পুত্রও ছিলেন।"

তিনি বলেন, "আমার মনে পড়ে, সেই সময় এই ইলহাম এত জোরালোভাবে আমার প্রতি নাযিল হয় যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই ইলহামের নাযিল হওয়ার অবস্থা এবং প্রভাব আমার উপর বজায় ছিল। আর এই ইলহাম এত স্পষ্ট ছিল যে যদিও ততদিনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন আমি ঘুরতে বের হয়ে আমার কতিপয় সমবয়সীদের কাছে এই কথা উল্লেখ করছিলাম তখন আমার মাথা থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের কথা বেরিয়ে যায় আর আমার ভিতর এই গভীর প্রেরণা সৃষ্টি হয় যেন আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এটি শুনাই।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ২৫ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯০)

পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা আমার মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার ব্যাপারে আমাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন তার সত্যায়নে চতুর্থ সাক্ষ্য হল আমার এই দিব্যদর্শনটি– আমি দেখি যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বায়তুদ দোয়ায় বসে দোয়া করছি; হঠাৎ করে আমার সামনে প্রকাশ করা হল যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইব্রাহীম ছিলেন, পুনরায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার সামনে এটি প্রতিভাত করা হয়েছে যে, এই উম্মতে আরো অনেক ইব্রাহীম অতিবাহিত হয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনিও ইব্রাহীম, তাঁর নাম আমাকে ইব্রাহীম আধম বলা হয়েছে। আধম নামে এক বাদশা ছিলেন, যিনি রাজত্ব জলাঞ্জলী দিয়ে সুফিদের জীবন আরম্ভ করেন। অতএব, আমাকে জানানো হয়েছে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ইব্রাহীম আধম ছিলেন, পুনরায় আমাকে বলা হয়েছে– তুমিও এক ইব্রাহীম।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ২৫ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯০)

পঞ্চম সাক্ষীর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "পঞ্চম সাক্ষ্য যা এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে আমার প্রতি হয়েছে তা হল– একবার স্বপ্নে দেখি যে, একটা ঘন্টা বাজল; তার ধ্বনি এমন ছিল, যেমনটি পিতলের কোন পাত্রকে কোন বস্তু দ্বারা আঘাত করলে যেভাবে 'ঠন' করে শব্দ হয়, তেমনি এই ঘন্টা থেকেও 'ঠন' করে শব্দ উদ্ভূত হয়। কিন্তু সেই ধ্বনি এত সুমধুর যে, মনে হল সারা পৃথিবীর সংগীতের সুমধুর ধ্বনি তাতে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধ্বনি ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে পুরো বায়ু মণ্ডলে ও আকাশে বাতাশে ছড়িয়ে গিয়ে একটা ফ্রেমের রূপ নেয় যেভাবে ছবি ফ্রেমবদ্ধ থাকে। এরপর আমি দেখেছি সেই ফ্রেমে একটা ছবি আত্মপ্রকাশ করে যা এক অত্যন্ত সুদর্শন এবং সুশ্রী ব্যক্তিত্বের ছিল। এরপর সেই ছবি নড়তে শুরু করে, একটু পরেই তা থেকে বেরিয়ে এক সত্তা আমার সামনে আবির্ভূত হন, যার সম্পর্কে আমার উপলব্ধি হয় যে তিনি খোদার ফেরেশতা। আর তিনি আমাকে বললেন যে, 'আস, আমি তোমাকে সূরা ফাতেহার পাঠ দিচ্ছি।' ফেরেশতা আমাকে সূরা ফাতেহার পাঠ দেওয়া আরম্ভ করেন এবং ক্রমাগতভাবে দিতেই থাকলেন, দিতেই থাকলেন, এভাবে 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈনের' তফসীর আরম্ভ করতে গিয়ে বলেন, 'আজ পর্যন্ত যত মুফাসসের এসেছে তারা সবাই 'মালিকি ইয়াউমিদ্দীন' পর্যন্ত তফসীর লিখেছে, কিন্তু আমি তোমাকে এর পরের তফসীরও শিখাচ্ছি।' পুরো সূরা ফাতেহার তফসীর তিনি আমাকে পড়িয়েছেন। আমার চোখ খোলার পরও স্বপ্নে সেই ফেরেশতা যেসব কথা আমাকে বলেছিল সেগুলোর কিছু কথা আমার মনে ছিল, কিন্তু সেগুলো আমি নোট করিনি, পরে আমি তা ভুলে যাই। সকালে এই স্বপ্নের কথা যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে শুনাই আর সাথে এটিও বলি যে, স্বপ্নে ফেরেশতা আমাকে যেসব কথা বলেছিল তার কতক চোখ খোলার পর আমার মনে ছিল কিন্তু সকালে জাগ্রত হওয়ার পর সেসব কথা আমার স্মৃতিপট থেকে মুছে যায়, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) রাগান্বিত হয়ে বলেন যে, 'তুমি এত অমূল্য জ্ঞানকে হেলায় নষ্ট করেছ! এগুলোকে নোট করা উচিত ছিল'।" তিনি (রা.) বলেন, "সেই দিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফাতেহা থেকে সবসময় আমাকে নিত্য-নতুন নিগূঢ় রহস্যের কথা বুঝান। এখনও এই স্বপ্ন দেখার পর আমি যখন ভাবলাম যে জামা'তের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য স্পষ্ট কী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া যেতে পারে, তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সূরা ফাতেহা থেকেই অতি স্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ পরিকল্পনা বুঝিয়েছেন যা অনুশীলন করে ইসলামের এমন উন্নতি হতে পারে যে শত্রু তা দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং ইসলামী শিক্ষা এবং সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা ছাড়া তার কোন উপায় থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই পরিকল্পনা অনুসারে সেসব ভুলভ্রান্তিরও নিরসন সম্ভব যা রসূলে করীম (সা.)-এর তিরোধানের পর মুসলমান ব্যবস্থাপনা ইসলাম এবং ইসলামী সামাজিক শিক্ষামালাকে বুঝতে গিয়ে করেছে (অর্থাৎ পরবর্তী যুগের মুসলমানরা যে ভুল-ভ্রান্তি করেছে)। এইসব কিছু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। এই স্বপ্নের আসল ব্যাখ্যা এটিই ছিল যে আমার অভ্যন্তরীন বৃত্তিতে বিশেষ করে সূরা ফাতেহার জ্ঞান এবং সার্বিকভাবে কুরআনের জ্ঞান প্রোথিত করা হয়েছে, যা প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে অন্তর্নিহিত ইলহামের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ২৫ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯০-৯২)

তিনি আরো বলেন, "জামা'তে যখন মতভেদ দেখা দেয় আল্লাহ্ তা'লা ইলহামে আমাকে জানিয়েছেন যে, 'লানুমাযযিকান্নাহুম' অর্থাৎ

এগারোর পাতায়....

জুমআর খুতবা

আজকের বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিচ্ছে। ইসলাম-বিরোধী অপশক্তিগুলো মুসলমানদেরকে এসব পরিস্থিতির জন্য দায়ী করে। এটিও একটি সত্য কথা যে, কিছু মুসলমান দল এবং সংগঠন ইসলামের নামে মুসলিম এবং অমুসলিম দেশ সমূহেও এমন অপকর্ম করে চলেছে, যাকে অন্যায় নিষ্পেষণ এবং বর্বরতা ছাড়া আর কোন নাম দেওয়া যায় না। আর এর সাথে ইসলামী শিক্ষার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এটিও সত্য কথা যে, একটি বিশেষ ষড়যন্ত্রের অধীনে মুসলমানদের মাঝে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে স্বার্থপর মুসলমান এবং মুনাফিক শ্রেণি, যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য এমন অপশক্তি গুলোর হাতের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেছে। যাহোক পৃথিবীর সার্বিক অবস্থা এখন ভয়াবহ। কতক মুসলমানের অপকর্মের কারণে ইসলাম-বিরোধী অপশক্তিগুলো ইসলামকে দুর্নাম করার প্রচুর সুযোগ পাচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই, আমরা আহমদী মুসলমানরাও এ কারণে এসবের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছি।

আহমদীরা শুধু মুসলমান হিসেবেই নয়, বরং মুসলমান বিশ্বে আহমদী হিসেবেও এসব কঠোরতার সম্মুখীন,আর তা শুধু এ কারণে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আগত আহ্বানকারীকে মেনেছি যিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে এসেছেন। পাকিস্তানে নিষ্ঠুর এবং নিষ্পেষণমূলক আইনের কারণে মৌলভীরা লাগামহীন। আর তাদের ভয়ে আদালতও অন্যায়-অবিচারে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু এখন আরও বিচার বিভাগ বা আদালত একই রীতি অবলম্বন করছে। মৌলভীদের ভয়ে নিরীহ আহমদীদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে।

আমাদের কাছে জাগতিক কোন শাসন বা সরকার নেই। জাগতিক ধন-সম্পদও নেই, আর তেলের অর্থও নেই। হ্যাঁ, আমাদের কাছে একটি জিনিস আছে যার প্রতি পৃথিবীর প্রতিটি আহমদীর গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। আর তা হল ইবাদত, সদকা-খয়রাত, আর্থিক কুরবানী এবং ইস্তেগফার করে খোদার নৈকট্য লাভ করা। এই বিষয়গুলোই খোদার কৃপা ও করুণা এবং দয়াকে আকর্ষণ করে, আর মানুষকে খোদা তা'লার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান দেয়।

মানুষের ভেতর বহু দুর্বলতা রয়েছে। প্রায় সময় জাগতিক ব্যস্ততার কারণে ইবাদতের দায়িত্ব আমরা যথাযথভাবে পালন করি না। ব্যক্তিগত সমস্যা আসলে আমরা সদকা-খয়রাতের দিকে কিছুটা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, নতুবা সেটিও করি না। ইস্তেগফারের প্রতি যেভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, সেই দায়িত্ব আমরা পালন করি না। আমাদের সবাই যদি আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণ করে তাহলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আমাদের মাঝে অধিকাংশ এই দায়িত্ব পালন করছে না। অতএব যদি খোদার কৃপাভাজন হতে হয়, তাঁর করুণাকে উদ্বেলিত করতে হয়, আর আমরা শত্রু এবং বিরোধীদের অপচেষ্টার ব্যর্থতা দেখতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে, যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি এবং তাঁর ক্ষমায় ধন্য করে।

কুরআন, হাদীস ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে ইবাদত প্রতিষ্ঠা, অধিকহারে তওবা ও ইসতেগফার এবং সদকা করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান।

মুকাররম মারঈ বারতবী সাহেব অব সিরিয়ার স্ত্রী মুকাররমা সাআদা বরতবী সাহেবার মৃত্যু, মরহুমার প্রশংসাসূচকগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত** ২৪ শে ফেব্রুয়ারী , ২০১৭, **এর জুমুআর খুতবা (২৪ তবলীগ, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:আজকের বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে সকলেই অবগত। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিচ্ছে। আর যেভাবে আমি বেশ কয়েকবার বলেছি, ইসলাম-বিরোধী অপশক্তিগুলো মুসলমানদেরকে এসব পরিস্থিতির জন্যদায়ী করে। এটিও একটি সত্য কথা যে, কিছু মুসলমান দল এবং সংগঠন ইসলামের নামে মুসলিম এবং অমুসলিম দেশ সমূহেও এমন অপকর্ম করে চলেছে, যাকে অন্যায় নিষ্পেষণ এবং বর্বরতা ছাড়া আর কোন নাম দেওয়া যায় না। আর এর সাথে ইসলামী শিক্ষার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এটিও সত্য কথা যে, একটি বিশেষ ষড়যন্ত্রের অধীনে মুসলমানদের মাঝে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে স্বার্থপর মুসলমান এবং মুনাফিক শ্রেণি, যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য এমন অপশক্তি গুলোর হাতের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেছে। যাহোক পৃথিবীর সার্বিক অবস্থা এখন ভয়াবহ। মুষ্টিমেয় মুসলমানের অপকর্মের কারণে ইসলাম-বিরোধী অপশক্তিগুলো ইসলামকে দুর্নাম করার অঢেল সুযোগ পাচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই, আমরা আহমদী মুসলমানরাও এ কারণে এসবের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছি।

যদিও যারা আমাদেরকে জানে তাদের কাছে এটি স্পষ্ট যে, আহমদীদের শিক্ষা এবং কর্ম প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রচার মাধ্যম মুসলমান এবং ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি করে রেখেছে তারফলে সাধারণ মানুষ আমাদেরকেও তেমনই মনে করে। কোন কোন দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন এবং বিভিন্ন পার্টি কোন কথা শুনতেই চায় না। আর নিছক নেতিবাচক চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়ার উপর জোর দেয়। জার্মানীর পশ্চিম অংশেও আমরা এই বিরোধিতার সম্মুখীন আর হল্যান্ডেও, যেখানে কিছু দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে। একইভাবে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও উগ্র দক্ষিণপন্থীরা মাথাচাড়া দিচ্ছে। আর আমেরিকার অবস্থা তো সকলেই জানে। এরপর আহমদীরা শুধু মুসলমান হিসেবেই নয়, বরং মুসলমান বিশ্বে আহমদী হিসেবেও এসব কঠোরতার সম্মুখীন,আর তা শুধু এ কারণে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আগত আহ্বানকারীকে মেনেছি যিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে এসেছেন। পাকিস্তানে নিষ্ঠুর এবং নিষ্পেষণমূলক আইনের কারণে মৌলভীরা লাগামহীন। আর তাদের ভয়ে আদালতও অন্যায়-অবিচারে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু এখন আরবদেশসমূহেও বিচার বিভাগ একই রীতি অবলম্বন করছে। মৌলভীদের ভয়ে নিরীহ আহমদীদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে। এখনো সেখানে অন্তত পক্ষে ১৬জন আহমদী শুধু আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে কারাজীবন ভোগ করছে। এমন পরিস্থিতিতে একজন আহমদীর কী করা উচিত?

আমাদের কাছে জাগতিক কোন শাসন বা সরকার নেই। জাগতিক ধন-সম্পদও নেই, আর তেলের অর্থও নেই। হ্যাঁ, আমাদের কাছে একটি জিনিস আছে যার প্রতি পৃথিবীর প্রতিটি আহমদীর গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। আর তা হল ইবাদত, সদকা-খয়রাত, আর্থিক কুরবানী এবং ইস্তেগফার করে খোদার নৈকট্য লাভ করা। এই বিষয়গুলোই খোদার কৃপা, করুণা এবং দয়াকে আকর্ষণ করে, আর মানুষ খোদা তা'লার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান পায়। ইবাদতের প্রতি, বিশেষ করে নামাযের

প্রতি এবং নামায আদায়ের প্রতি গত খুতবা গুলোতে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আজ আমি সদকা, আর্থিক কুরবানী এবং ইস্তেগফারের বিষয়ে বেশি কথা বলবো। কেননা, এগুলো খোদার করুণা এবং কৃপা আকর্ষণের মাধ্যম। মানুষের ভেতর বহু দুর্বলতা রয়েছে। প্রায় সময় জাগতিক ব্যস্ততার কারণে ইবাদতের দায়িত্ব আমরা যথাযথভাবে পালন করি না। ব্যক্তিগত সমস্যা আসলে আমরা সদকা-খয়রাতের দিকে কিছুটা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, নতুবা সেটিও করি না। ইস্তেগফারের প্রতি যেভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, সেই দায়িত্ব আমরা পালন করি না। আমাদের সবাই যদি আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণ করে তাহলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আমাদের মাঝে অধিকাংশ এই দায়িত্ব পালন করছে না। অতএব যদি খোদার কৃপাভাজন হতে হয়, তাঁর করুণাকে উদ্বেলিত করতে হয়, আর আমরা শত্রু এবং বিরোধীদের অপচেষ্টার ব্যর্থতা দেখতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে, যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি এবং তাঁর ক্ষমা লাভের কারণ হয়।

আল্লাহ্ তা'লা যেখানে বলছেন, আমি তওবা, ইস্তেগফার এবং সদকা-খয়রাত গ্রহণ করি, এটি এজন্য যেন তওবা-ইস্তেগফারের প্রতি তোমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। যেন তোমাদের সমস্যা দূর করতে পারি, যেন তোমাদের ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা দূরীভূত করে আমার চরণে ঠাঁই দিই। আর তোমাদের অতীত পাপ ক্ষমা করতে পারি, তোমাদের সঠিক দাসত্বের তৌফিক দিই, আর তোমাদের প্রতি করুণাবারি বর্ষণ করতে পারি। যেভাবে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

اَلَمۡ یَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ ہُوَ یَقۡبَلُ التَّوۡبَۃَ عَنۡ عِبَادِہٖ وَ یَاۡخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ اَنَّ اللّٰہَ ہُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیۡمُ ۔(التوبۃ:104)

(সূরা আত্-তওবা: ১০৪) অর্থাৎ, এরা কী জানে না যে, আল্লাহ্ তা'লাই স্বীয় বান্দাদের তওবা গ্রহণ করেন, এবং সদকা-খয়রাত ও আর্থিক কুরবানী গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ্ তা'লাই তওবা গ্রহণকারী এবং বার বার কৃপাকারী।

সদকা ও দোয়ার গুরুত্ব এবং এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"সদকা' শব্দটি সিদ্ক থেকে উৎসারিত হয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি খোদা তা'লার পথে সদকা দেয়, অর্থাৎ আর্থিক কুরবানী ও সদকা-খয়রাত করে, বোঝা গেল খোদার সাথে তার নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে"। সত্যভিত্তিক সম্পর্ক রয়েছে। "আর দ্বিতীয়টি হল দোয়া। দোয়ার ফলে হৃদয়ে এক প্রকার বিগলন এবং বেদনা সৃষ্টি হয়। (দোয়া হল সেটি, যা মন এবং অন্তরাত্মাকে বিগলিত করে) দোয়ায় এক কুরবানী এবং ত্যাগের দিক রয়েছে। নিষ্ঠা ও দোয়া এ দু'টো বিষয় যদি লাভ হয় তাহলে এটি এক মহৌষধ। " এই উভয়টি যদি একই সাথে মানুষের লাভ হয় তাহলে এটি এক সফল চিকিৎসা।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৭-৮৮)

অতএব ইস্তেগফারও এক প্রকার দোয়াই। মানুষ নিজের দুর্বলতা এবং পাপকে সামনে রেখে যদি দোয়া করে তাহলে এর ফলে হৃদয় এবং মন বিগলিত হয়। আর এমনটিই হওয়া উচিত। হৃদয়ে এক বেদনা সৃষ্টি হওয়া উচিত। শুধু মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ্ আস্তাগফিরুল্লাহ্ বলা, আর মনোযোগ আল্লাহ্র পরিবর্তে যদি অন্য কোন জায়গায় থাকে তাহলে এই লক্ষ্য অর্জন হয় না। অতএব খোদা তা'লা দোয়া গ্রহণ করেন আর সদকা-খয়রাত ও আর্থিক কুরবানী যা উৎকণ্ঠার সময় খোদার কৃপাভাজন হওয়ার জন্য দেওয়া হয়, আল্লাহ্তা'লা তা গ্রহণ করেন। অধিকন্তু বান্দা যখন একই সাথে এই অঙ্গীকারও করে যে, ভবিষ্যতে আমি স্বীয় দুর্বলতা এড়িয়ে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করব এবং খোদার কৃপারাজিকে আকর্ষণের চেষ্টা করে, তাহলে খোদা তা'লা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে শুভ সংবাদ দিয়েছেন- এখানে দোয়া এবং সদকা গৃহীত হওয়ার বিষয়টি তিনি আরো ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বন্দাদের জানিয়ে দাও, যদি আমার বান্দা আমার দিকে এক পা অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে দুই পা অগ্রসর হই। আমার বান্দা দ্রুত হেঁটে আমার দিকে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (বুখারী, কিতাবুত তওহীদ)অতএব খোদার কৃপা এবং করুণার কোন শেষ নেই।

এরপর মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত লজ্জাশীল, উদার ও দানশীল। বান্দা তাঁর সামনে দোয়ার জন্য হাত উঠালে তিনি সেই হাত খালি এবং ব্যর্থ ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

(সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুদ দাওয়াত)

হ্যাঁ, এটি হতে পারে যে, বান্দা যেভাবে ফলাফলের বাসনা রাখে বা ফলাফল দেখতে চায়, অবিকল সেভাবেই আর তখনই এর ফলাফল প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক নয়। অনেক সময় আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে কিছুকাল পর বা অন্য কোন ভাবে সেসব দোয়া এবং আর্থিক কুরবানী ও সদকা-খয়রাতের ফলাফল প্রকাশ করেন। আবার কখনো অবিকল সেভাবেই ফলাফল প্রকাশ পায় যেভাবে বান্দা চায়।

অতএব এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন, আমি দোয়া গ্রহণ করি, আমি ইস্তেগফার কবুল করি, আমি আর্থিক কুরবানী এবং সদকা-খয়রাত গ্রহণ করি, অতএব মানুষ যখন পাপের ক্ষমা চায়, ভবিষ্যতের পাপ এবং গুনাহ্ থেকে বাঁচার অঙ্গীকার করে, একইসাথে সর্বাত্মক চেষ্টাও করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তা গ্রহণ করেন, আর সকল প্রকার দুশ্চিন্তা এবং সমস্যা থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেন।

সবসময় স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাই আমাদের লোক দেখানো কাজ সেভাবে গৃহীত হয় না। আর বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে যদি কোন কিছু করা হয় তাহলে মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন, তা আল্লাহ্ তা'লা ফলাফল শূণ্য যেতে দেন না। আল্লাহ্ তা'লা তো এতই দয়ালু যে, নিজ বান্দাদের প্রতি তাঁর করুণা এবং দয়ার চিত্র দেখুন- মহানবী (সা.) বলেন, যারা সদকা-খয়রাত করার মত আর্থিক সঙ্গতি রাখে না তাদের জন্য নেক কাজ করা আর মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই সদকা-খয়রাতের সমান পুণ্য বয়ে আনে।

(সহী বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

তাদের ইবাদত, ইস্তেগফার এবং নেক কর্ম অর্থাৎ অন্যের কল্যাণ সাধনের জন্য যা করা হয়ে থাকে, তা যেখানে ইবাদত এবং ইস্তেগফার হিসেবে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা পাবে সেখানে তাদের নেক কাজ এবং পুণ্য কর্ম, সদকা-খয়রাতের মত পুণ্য বয়ে আনবে। একজন সচ্ছল ব্যক্তি আর্থিক কুরবানী করে, সদকা-খয়রাত করে যে পুণ্য পাবে, এক দরিদ্র ব্যক্তি নিয়্যতের স্বচ্ছতার কারণে অন্যান্য নির্দেশ যদি মেনে চলে, তাহলে সেও একইভাবে সদকা-খয়রাত এবং আর্থিক কুরবানীর সুফল ভোগ করবে। সুতরাং এমন স্নেহশীল খোদার প্রতি কীভাবে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যিনি আমাদেরকে কেবল দুর্বলতা এড়িয়ে চলার রীতিই শেখান নি, বরং একইসাথে এটিও বলেছেন যে, আমি তোমাদের সেসব কর্ম, যা পাপ এবং দুর্বলতামুক্ত থাকার জন্য তোমরা করে থাক, তাকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিয়ে তোমাদের সমস্যা এবং বিপদাপদ থেকেও নিষ্কৃতি দিব। অতএব সমস্যা থেকে উত্তরণের একমাত্র মাধ্যম এবং উপায় হল, ইবাদত এবং দোয়াকে বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ করে আল্লাহ্র সামনে নতজানু হন, ইস্তেগফারের উপর জোর দিন। ব্যক্তিগত ভাবেও আর সমষ্টিগত ভাবেও আর্থিক কুরবানী এবং সদকা-খয়রাতের উপর জোর দিন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর্থিক কুরবানী, সদকা-খয়রাত এবং ইস্তেগফার সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণণা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর কয়েকটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

ইস্তেগফারের প্রকৃত মর্ম এবং তত্ত্ব তুলে ধরতে গিয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"পাপ এমন একটি কীট যা মানুষের রক্তে সঞ্চালিত হচ্ছে, কিন্তু এর চিকিৎসা কেবল ইস্তেগফারের মাধ্যমেই সম্ভব। ইস্তেগফার কী? ইস্তেগফার হল, যে পাপ হয়ে গেছে বা যে পাপ আমাদের হাতে সাধিত হয়েছে, তার কুফল থেকে যেন খোদা তা'লা রক্ষা করেন। আর যেসব পাপ এখনো হয় নি এবং যা ঘটা সম্ভব, বা যা করার শক্তি মানুষের মাঝে রয়েছে, কিংবা যা পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে, তা প্রকাশ পাওয়ার কোন সুযোগই যেন না আসে এবং সেই পাপ যেন না হয়, এটিই ইস্তেগফার। আর অভ্যন্তরীণভাবে তা জ্বলে পুড়ে যেন ছাই হয়ে যায়। অর্থাৎ অতীতের পাপ থেকে মুক্তি এবং ভবিষ্যৎ পাপ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা, যেন আমরা খোদার কৃপাভাজন হতে পারি, তিনি যেন আমাদেরকে স্বীয় কৃপা এবং অনুগ্রহে ধন্য করেন। তিনি (আ.) বলেন, এটি বড় ভীতিপ্রদ সময়। তাই তওবা এবং ইস্তেগফারে নিয়োজিত থাক এবং আত্মজিজ্ঞাসায় রত থাক। সব ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের মানুষ আর আহলে কিতাব এটি মানে যে, সদকা-খয়রাতের কল্যাণে শাস্তি টলে যায়। কিন্তু সেটি নাযেল হওয়ার পূর্বের বিষয়। একবার যদি শাস্তি নাযেল হয়, তাহলে তা টলে না। অতএব তোমরাও এখন থেকেই ইস্তেগফার আরম্ভ কর, আর তওবায় নিয়োজিত

হও, যেন তোমাদের পালা না আসে, আর খোদা তা'লা যেন তোমাদের সুরক্ষা করেন।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৯)

এখনো সমস্যা সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। ছোট ছোট এবং ক্ষুদ্র পরিসরে সমস্যা চোখে পড়ছে। কিন্তু পৃথিবী যেদিকে ধাবিত হচ্ছে, আর মানুষ যেভাবে লাগামহীন হয়ে উঠছে এবং যেভাবে খোদার অসন্তুষ্টির কারণগুলো সামনে আসছে, এর ফলে মানুষ সেই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যে ধ্বংসযজ্ঞ আসবে মানুষের নিজের হাতে। পৃথিবী খোদার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এমন সময়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্যকারীদের দায়িত্ব হল, আমরা যেখানে নিজেদেরকে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য তওবা এবং ইস্তেগফারের উপর জোর দিব, সেখানে মোটের উপর পৃথিবী বাসীর জন্যও দোয়া করব, আল্লাহ্তা'লা যেন তাদেরকে কাণ্ডজ্ঞান দান করেন।

এরপর ইস্তেগফারের প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ আর তত্ত্ব তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"স্পষ্ট হওয়া উচিত, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লার দু'টো নাম উপস্থাপিত হয়েছে। একটি হল আল-হাই, অপরটি আল-কাইয়্যূম। আল-হাই এর অর্থ হল নিজে জীবিত এবং অন্যদের জীবনদাতা। আল-কাইয়্যূম এর অর্থ যিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যের প্রতিষ্ঠা লাভের মূল কারণ। সবকিছুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অস্তিত্ব এবং জীবন এই দু'টোর কারণেই। হাই শব্দের দাবি হল তাঁর ইবাদত করা। যেভাবে সূরা ফাতেহায় إِيَّاكَ نَعْبُدُ-তে এর বিকাশ বা প্রকাশ দেখা যায়। আর কাইয়্যূম-এর দাবি হল তাঁর কাছে অবলম্বন যাচনা করা। إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বাক্যের মাধ্যমে এটি প্রকাশ করা হয়েছে। 'হাই' শব্দ ইবাদতের দাবি রাখে, কেননা, তিনি সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করে তিনি অসহায় পরিত্যাগ করেন নি। যেমনযে মিস্ত্রি ভবন নির্মাণ করে, সে মারা গেলে ভবনের কোন ক্ষতি হয় না বা কিছু যায় আসে না। কিন্তু মানুষ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার মুখাপেক্ষি থাকে। তাই খোদার কাছে শক্তি যাচনা করতে থাকা আবশ্যক, আর এটিকেই ইস্তেগফার বলা হয়। পাপ থেকে মুক্ত থাকার শক্তি যাচনা করতে থাকা, তাঁর ইবাদতের জন্য শক্তি চাওয়া। আর এই শক্তি চাওয়া বা শক্তি যাচনা করাই হল ইস্তেগফার। ইস্তেগফারের প্রকৃত মর্ম এবং তত্ত্ব আর অর্থ এটিই। আর এটিকে বা এর অর্থকে তাদের জন্য বিস্তৃত করা হয়েছে যারা পাপে লিপ্ত হয়, যেন তারা পাপের কুফল থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু আসল অর্থ হল মানবীয় দুর্বলতা থেকে রক্ষা পাওয়া। তিনি বলেন, অতএব যে ব্যক্তি মানুষ হয়ে ইস্তেগফারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না, সে অভদ্র নাস্তিক।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৭)

খোদার নৈকট্য লাভ করা, আর তওবা ও ইস্তেগফারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"মানুষ অনেক বড় কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছে।" (এই কাজের বিশদ বিবরণ তিনি (আ.) পূর্বে এটি তুলে ধরেছেন যে, মানুষ যেন নিজের ব্যবহারিক অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে। মানুষের জন্য এটি অনেক বড় একটি কাজ অর্থাৎ নিজের অবস্থায় পরিবর্তন আনা, আর খোদার সাথে মিমাংসা করা, তাঁকে অসন্তুষ্ট না করা এবং এ বিষয়টি উদ্ঘাটন করা যে, সে কী উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে এসেছে। মানুষের এটি জানা থাকা উচিত যে, সে কেন পৃথিবীতে এসেছে। আর আমরা জানি যে, আল্লাহ্ তা'লা নিজেও এটি বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করে তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য।) তিনি বলেন, "মানুষ অনেক বড় কাজের জন্য প্রেরীত হয়েছে, এরপর যখন সময় এসে যায় আর তার কাজ অসম্পূর্ণ থাকে তখন খোদা তা'লা তার জীবনের যবনিকাপাত ঘটান। এক সেবক বা ভৃত্যকেই দেখ, সে যদি সঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে তার মুনিব তাকে ছুটি দিয়ে দেয়। সুতরাং খোদা তা'লা সেই ব্যক্তিকে কেন জীবিত রাখবেন যে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে না? তিনি (আ.) উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, "আমাদের মির্যা সাহেব, (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মরহুম পিতা) পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা দিতে থাকেন। তিনি বলতেন, তিনি কখনো কোন মোক্ষম বা সফল ব্যবস্থাপত্র পাননি। সত্য কথা হল আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি ছাড়া মানুষের ভেতর প্রবেশকারী একটি বিন্দুও উপকারী হতে পারে না। তিনি বলেন, তওবা ও ইস্তেগফার অনেক বেশি করা উচিত যেন খোদা তা'লা কৃপাভাজন করেন। খোদার কৃপারাজি নাযেল হলে দোয়াও গৃহীত হয়। আল্লাহ্ তা'লা এ কথাই বলেছেন যে, দোয়া কবুল করব বা গ্রহণ করব। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বলেছেন যে, আমার তকদীরকে শিরোধার্য কর। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তাই আমি যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি বা নির্দেশ না দেখি, গৃহীত হওয়ার আশা কমই রাখি। বান্দা খুবই দুর্বল এবং অসহায়, তাই খোদার কৃপার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত।"
(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৯)

আর এর জন্য প্রতিটি মুহূর্ত খোদার পথপানে চেয়ে থাকা উচিত, তাঁর আঁচল আঁকড়ে ধরে রাখা উচিত, তওবা এবং ইস্তেগফারের প্রয়োজন, খোদার প্রাপ্য প্রদান এবং বান্দাদের অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

এরপর ক্রন্দন এবং সদকা-খয়রাত অপরাধ সংক্রান্ত বিবরণ ও তথ্যাদিকে মুছে ফেলে। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"দোয়া সফলতার জন্য অনেক বড় এক ঢাল। হযরত ইউনুস (আ.)-এর জাতি আহাজারি, ক্রন্দন এবং দোয়ার কারণে আগত শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে। তিনি বলেন, আমি মনে করি 'মুগাযেবাত' কে 'মুহাতেবাত' বলা হয় (অর্থাৎ পরস্পর রাগান্বিত হওয়া এবং একে অপরের উপর ক্রোধান্বিত হওয়া) অর্থাৎ রাগ এবং অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশকে মুহাতেবাত বলা হয়। তিনি বলেন, হূত মাছকে বলা হয় আর নূন বলতে রাগ এবং ক্রোধকেও বুঝায়, আর মাছকেও। অতএব হযরত ইউনুসের সেই অবস্থা ছিল রাগের অবস্থা, ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। আসল বিষয় হল, শাস্তি টলে যাওয়ার কারণে তাঁর মনে অভিযোগ দানা বাঁধে অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী এবং দোয়া বৃথা গেল। আর এই ধারণা বা এই অভিযোগও তার হৃদয়ে দানা বাঁধে যে, আমার কথা কেন পূর্ণ হল না। অতএব এটি ছিল রাগের এক চিত্র বা রাগের বহিঃপ্রকাশ। এটি থেকে শিক্ষনীয় বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লা তকদীরকে পাল্টে দেন, আর ক্রন্দন এবং সদকা-খয়রাত, অপরাধের তালিকা বা ফর্দকে মিটিয়ে দেয়। খয়রাত বা পুণ্যকর্মের মূলনীতি এটি থেকেই উদ্ভূত। এই রীতি খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করে। স্বপ্ন-ব্যাখ্যা শাস্ত্র অনুযায়ী সম্পদ কলিজা হয়ে থাকে। তাই খয়রাত করা প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার নামান্তর। মানুষ খয়রাত করার সময় কতটা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা প্রদর্শন করে, এটি হল দেখার বিষয়। আসল কথা হল, শুধু কথার দ্বারা কিছুই অর্জিত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যত কোন কিছু প্রকাশ করা না হয়। তিনি বলেন, "এটিকে সদকা এজন্য বলা হয় যে, এটি সত্যবাদীদের উপর একটি ছাপ সৃষ্টি করে। হযরত ইউনুসের কাহিনী সম্পর্কে 'দুররে মনসূর'-এ লিখা আছে যে, তিনি বলেন, আমি পূর্বেই জানতাম যে, যখন তোমার কাছে কেউ আসবে তখন তুমি তার প্রতি করুণাভাজন হবে।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৭-২৩৮)অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা করুণাভাজন হবেন।

এক বৈঠকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বদর পত্রিকায় এর বিশদ বিবরণ এসেছে যে, বাহির থেকে কিছু লোক আসলে জুমুআর নামাযের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বসে যান। পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে, জুমুআর পর চতু র্পাশের মানুষ বয়আত করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে রীতিমত নামায পড়া ও রোযা রাখা এবং সকল অন্যায় এড়িয়ে চলা সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন-যে, ঘরে স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্র, সবাইকে পুণ্যের নসীহত করুন। যেভাবে বৃক্ষরাজি এবং খেত-খামারে ভালোভাবে পানি দেওয়া না হলে ফল ধরে না, অনুরূপভাবে হৃদয়কে যদি পুণ্যের পানি দ্বারা সিঞ্চন করা না হয় তাহলে তা আর কোন কাজের নয়। তিনি বলেন, ঘরে একের পর এক পুণ্য কর্ম হওয়া উচিত যেন দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আর ইস্তেগফারের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে, আর অন্যান্য নেক কর্মের প্রতিও মনোযোগ যায়। এই পানির কল্যাণেই পুণ্যের চারাগাছ বড় হয় এবং ঈমান দৃঢ়তা লাভ করে। যেসব বৈঠকে হাসি-ঠাট্টা বা হাসি-তিরস্কার হয় তা এড়িয়ে চলার বিষয়ে তিনি নসীহত করেছেন। এরপর নবীদের এই নসীহতের কথা স্মরণ করিয়েছেন যে, সদকা এবং দোয়ার কল্যাণে বিপদাপদ টলে যায়। তিনি বলেন, যদি অর্থ-কড়ি না থাকে তাহলে কাউকে কূপ থেকে এক বালতি পানি তুলে দিলে তাও একটি সদকা গণ্য হবে। নিজের সম্পদ এবং দৈহিক শক্তির মাধ্যমে কারো খেদমত করাও সদকা।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮১-৮২)

অতএব খোদার কৃপাভাজন হওয়ার জন্য রীতিমত ইবাদত করা যেমন আবশ্যক, তেমনই সকল প্রকার যুলুম এবং অত্যাচার বর্জন করা এবং মানুষের কাজে আসাও আবশ্যক। ঘরে বেশির ভাগ সময় জাগতিক কার্যকলাপে ব্যয় না করে পুণ্য সংক্রান্ত কথা বলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। এমন সব বৈঠক বা মজলিস এড়িয়ে চলা আবশ্যক যেখানে কেবল হাসি-তিরস্কার ছাড়া আর কিছুই হয় না বা যেখানে অন্যদের তিরস্কারের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। আর রসূলে করীম (সা.) যেভাবে বলেছেন, মারুফ বা ন্যায়সঙ্গত বিষয়কেই ভিন্ন বাক্যে সদকা বলা হয়।

মানুষের কাজে আসাও একটি সদকা। যে মানুষের সমস্যা দূরীভূত করে সেও এক প্রকার সদকা দেয়। অতএব এদিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেন,

"সব ধর্মের সর্বসম্মত বিষয় হল সদকা এবং খয়রাত করলে বিপদাপদ টলে যায়। আর বিপদাপদের আগমন সংক্রান্ত সংবাদ যদি আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই দিয়ে থাকেন তাহলে সেটি 'ওয়াঈদ'বা শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। তওবা করলে এবং খোদার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীও টলতে পারে। তিনি বলেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর একথায় বিশ্বাসী ছিলেন যে, সদকা-খয়রাতে বিপদাপদ টলে যায়।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৭)

যদি বিপদাপদ এমন বিষয় হয়ে থাকে যা টলার নয়, তাহলে সদকা-খয়রাত বা সব নেক কর্ম ব্যর্থ হয়। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যখন বলেন যে, আমি সদকা গ্রহণ করি, এর অর্থ হল, এমন পরিস্থিতিতেও তিনি গ্রহণ করার শক্তি রাখেন এবং গ্রহণ করেন। আর এ সম্পর্কে অনেক সময় নবী এবং প্রেরীতদের মাধ্যমে তিনি সংবাদও দেন যে, এমন হবে। আর শাস্তি সংক্রান্ত সংবাদও দিয়ে থাকেন, যেভাবে ইউনুসের জাতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা অবহিত করেছিলেন। আর তাঁর জাতি দোয়া, সদকা এবং ক্রন্দন আর আহাজারির কল্যাণে রক্ষা পেয়েছে এবং ধ্বংস সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তা টলে যায়। অতএব, সদকা এবং খয়রাতের ফলে নবীদের কৃত ভবিষ্যদ্বাণী যেখানে টলতে পারে, সেখানে যে সমস্ত বিপদাবলী বা সমস্যা মানুষের নিজের অপকর্মের ফলে সামনে আসে বা আসার আশঙ্কা থাকে, খোদা তা'লাকে ভুলার ফলে যা সামনে আসে, তা কেন খোদার দিকে ঝুঁকলে, তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে, ইস্তেগফার এবং তওবা করলে, সদকা এবং খয়রাত করলে টলবে না? অবশ্যই টলতে পারে। তবে শর্ত হল আমাদের ক্রন্দন, আহাজারি, দোয়া এবং সদকা করা, আর আর্থিক কুরবানী করা যেন খোদার নির্দেশ-সম্মত হয়। মহানবী (সা.) একবার বলেছেন, সদকা খোদা তা'লার ক্রোধকে নিবারণ করে আর অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। (সুনান তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত) তিনি বলেন, সদকা দিয়ে আগুন থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর, এমনকি অর্ধেক খেজুর দিয়ে হলেও।

আমরা পূর্বে তার এই উক্তিও শুনেছি যে, ভাল কাজ বা নেক কথাকে কাজে রূপায়িত করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাও সদকা। অতএব এই বিষয়গুলো সব সময় সামনে রাখা উচিত। একই সাথে এটিও স্মরণ রাখা উচিত, আর পূর্বেও এর উল্লেখ এসেছে যে, ইস্তেগফার এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। হৃদয় থেকে উদ্ভূত ইস্তেগফার ভবিষ্যতের পাপ থেকে রক্ষা করে।এর ফলে খোদার কৃপাও উথলে উঠে এবং খোদার নৈকট্যলাভ হয়।

মহানবী (সা.) একবার বলেন যে, তোমাদের মাঝে যার জন্য দোয়ার দ্বার খোলা হয়েছে তার জন্য যেন রহমতের দ্বার উন্মোচন করা হয়েছে। আর খোদার কাছে যেসব বিষয় যাচনা করা হয় সেগুলোর মাঝে তাঁর দৃষ্টিতে সবচেয়ে পছন্দনীয় হল আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিরাপত্তা যাচনা করা, তাঁর আশ্রয়ে আসার দোয়া করা। (সুনান তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)

মহানবী (সা.) বলেন, যে বিপদ বা পরীক্ষা এসে গেছে আর যা এখনো আসে নি দোয়া এই সমস্ত ক্ষেত্রে উপকারী হয়ে থাকে। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমাদের জন্য দোয়ার রীতি অবলম্বন করা আবশ্যক। (মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৭)

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রেখ, "ঔদাসীন্যের পাপ অনুশোচনার পাপ থেকে অনেক বড় হয়ে থাকে। এই পাপ বিষাক্ত এবং প্রাণঘাতী হয়ে থাকে। তওবাকারী এমন যেন সে পাপই করে নি। যে সত্যিকার অর্থে তওবা করেছে, ইস্তেগফার করেছে, অতীতের পাপের ক্ষমা চেয়েছে, ভবিষ্যতে পাপমুক্ত থাকার অঙ্গীকার করেছে সে এমন যেন কখনো পাপই করে নি। যে জানেই না যে, সে কি করছে, সে বড় ভয়াবহ অবস্থায় রয়েছে। তাই ঔদাসীন্য পরিহার করা আবশ্যক। জানা উচিত যে, আমরা কি করছি। আমাদের প্রতিটি কর্মের উপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি থাকা চাই। তিনি বলেন, পাপ থেকে তওবা কর এবং খোদাকে ভয় কর। যে ব্যক্তি তওবা করে, অনুশোচনা করে, আত্ম-সংশোধন করে, অন্যদের মোকাবেলায় তাদেরকে রক্ষা করা হবে। অতএব, দোয়া তারই কাজে আসতে পারে, যে নিজের সংশোধন করে এবং খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক-বন্ধন রচনা করে। তিনি বলেন, নবী যদি কারো জন্য শাফায়াত করেন, কিন্তু যার পক্ষে শাফায়াত করা হয়েছে সে যদি আত্ম-সংশোধন না করে আর ঔদাসীন্যপূর্ণ জীবন বর্জন না করে, তাহলে সেই শাফায়াত তাকে রক্ষা করতে পারবে না।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩০)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন দোয়ার প্রকৃত মর্ম অনুধাবনকারী হই, বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার সামনে যেন বিনত হই, ইস্তেগফারের প্রতি যেন মনোযোগী হই। আর আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে অতীত পাপের জন্য যেন ক্ষমা যাচনা করতে পারি এবং ভবিষ্যতে কোন পাপ করা থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার করে সেই অঙ্গীকারের উপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত থাকার যেন চেষ্টা করি। বিপদাপদ দূরীভূত করার জন্য আমরা যেন এমন সদকা-খায়রাত করতে পারি যা খোদার দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সব সময় স্বীয় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে রাখুন। শত্রু এবং সকল বিরোধীর আক্রমণ থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন, আর তাদের আক্রমণের কুফল যেন তাদের উপরই বর্তায়। আমরা যেন সব সময় খোদার সেই সব বান্দাদের মাঝে গণ্য হতে পারি যারা খোদাভীতিকে হৃদয়ে স্থান দেয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও মহানবী (সা.)-এর দোয়ার যেন আমরা উত্তরাধিকারী হই এবং তা থেকে যেন আমরা অংশ পাই।

নামাযের পর আমি এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা নামায পড়াব। এটি সা'দা বার্তাভী সাহেবার জানাযা যিনি মারি বার্তাভী সাহেবের স্ত্রী। দামেস্কের কূশ আরবে তার ইন্তেকাল হয়েছে। ঘরে সেন্ট্রাল হিটিং-এর জন্য ব্যবহৃত গ্যাস লিক হয়ে আগুন লেগে যাওয়ায় তার শরীর ঝলসে যায়। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসায় কিছুটা আরোগ্যও লাভ হয়েছিল। এই ঘটনার পরও তিনি পরম ধৈর্য প্রদর্শন করেন আর কৃতজ্ঞতা এবং খোদার প্রশংসায় রত ছিলেন। সবাইকে বলতেন যে, আমরা খোদার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট, কিন্তু ডাক্তারের ধারণা অনুসারে কয়েক দিন পর তার মারাত্মক হার্ট এ্যাটাক হয়, যা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। গত ১০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি তার স্বামীর পর ২০০৪ সনে বয়আত করেন, কিন্তু নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় নিজের স্বামী এবং সন্তানদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী ছিলেন। তার স্বামী জনাব মারী সাহেব বর্ণনা করেন, বয়আতের কিছুকাল পর তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন, আর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় একদিন সিড়ি থেকে পড়ে যান। এর ফলে তার ভ্রূণও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। রাতে ঘুমানোর পর তিনি স্বপ্নে দেখেন, আকাশ থেকে এক ব্যক্তি বলছে যে, ভয় পেও না, আল্লাহ্ তা'লা এই ভ্রূণের সুরক্ষা নিশ্চিত করবেন। এরপর সিদ্ধান্ত হয় যে, যদি ছেলে হয় তাহলে তার নাম রাখা হবে আহমদ, আর তা-ই করেছেন। এরপর সেই সন্তানের বয়স যখন ছয় বছর ছিল তখন এমনই আরেকটি স্বপ্ন দেখেন যে, আকাশ থেকে ধ্বনি আসছে, আল্লাহ্ তা'লা এই সন্তানের হেফাজতকারী। এর পর একদিন তিনি ছেলের সাথে মহা সড়কের পাশে হাঁটছিলেন। হঠাৎ বাচ্চা মায়ের হাত ছাড়িয়ে রাস্তা পার হতে যায়, ঘটনার আকস্মিকতায় মা মাথায় হাত দিয়ে নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলেন। চোখ খোলার পর তিনি দেখেন যে, তার শিশু নিরাপদে রাস্তার অপর প্রান্তে পৌঁছে গেছে আর মার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। এতে তার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। তার স্বামী বলেন, পুণ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। যখনই আমার মাথায় কারো প্রতি কোন পুণ্য করার ধারণা আসতো, আমি ভাবতাম স্ত্রীকে বলব যে, আমাদের এমনটি করা উচিত। তখন তার স্ত্রী বলতেন যে, আমারও এমনটি মাথায় এসেছিল, তাই আমি এই বিশ্বাসের সাথে সেই অনুসারে কাজ করেছি যে, আপনি এর বিরোধিতা করবেন না। স্বামী নেকী করার চিন্তায় ছিলেন আর স্ত্রী ইতোমধ্যেই সেই নেক কর্ম করে শেষ করেছেন। তার স্বামী বলেন যে, এমন ঘটনাশূণ্য সপ্তাহ বিরলই অতিবাহিত হয়ে থাকবে।

জার্মানিতে তার জামাতা রয়েছেন মুসআব সুয়ায়রী সাহেব। তিনি বলেন, খুবই পুণ্যবতী এবং সরলমতী মহিলা ছিলেন, কারো প্রতি শত্রুতা ছিল না, বড়ই দানশীলা এবং উদার ছিলেন। ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত তার স্বামীর বন্দীদশার সময় বড় কষ্টে সন্তানদের লালন-পালন করেছেন। সবার দেখাশুনা করেছেন আর অতীতের ঋণও পরিশোধ করেছেন। প্রতিটি পুণ্যকর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। সবার প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন। রীতিমত চাঁদা দিতেন। দামেস্কের কূশ আরবে তারদাফন কর্ম সমাপ্ত হয়েছে। দাফনের পূর্বে আহমদী এবং অ-আহমদীরা পৃথক পৃথক জানাযা পড়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার রূহের মাগফিরাত করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

আইওয়ানে তাহের, কানাডায় ২২ শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনে অংশগ্রহণকারী অতিথিবর্গের প্রতিক্রিয়া

* পাদরী চার্লস ওলাঙ্গো নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: যতদূর আমি দেখেছি, খলীফাতুল মসীহ হলেন ইসলামের সবথেকে বড় নেতা। তিনি যেভাবে এবং যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সেগুলি খোদা তা'লার ইচ্ছার অনুরূপ। মুসলমানদের অন্যান্য নেতাদেরকেও এই পদ্ধতিতেই ইসলামের বাণী পৌঁছানো উচিত। ইসলাম যে তার মান্যকারীদেরকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা প্রদান করার কঠোর নির্দেশ দিয়েছে, ইসলামের এমন শিক্ষার কথা এই প্রথমবার শুনলাম। আমি হুযুর আনোয়ার-এর বক্তব্যে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। হুযুর-এর ইচ্ছা সমস্ত ধর্মের নেতাগণ যেন একত্রে বসে আলোচনা করতে পারে।

*এলস মাল্টন ইন্টারিও নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: আমি খলীফাতুল মসীহর এই ভ্রমণটিকে বিশেষ সমীহের দৃষ্টিতে দেখি। কয়েক মাস পূর্বে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায়, কানাডার জলসা সালানায় এবং হুযুর-এর পার্লামেন্টে আগমণের সময় যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাত হয়, তখন আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার। অবশেষে আজকে সাক্ষাত হল। হুযুরের বার্তা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি সকলের জন্য শান্তি, সৌহার্দ্য ও ভালবাসা চান। আমি নিজের আবেগকে ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।

*হাইডি মেনোটি একজন প্রাক্তন শিক্ষক, তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: আমি আজকে এখানে নিজের বোনের সঙ্গে এসেছি। কেননা সে সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমি দেখতে চাইতাম যে, জামাতে আহমদীয়ার শিক্ষামালা কি? হুযুর আনোয়ার-এর বার্তা শুনে আমি যারপরনায় আনন্দিত হয়েছি যে, আমার বোন এমন মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যারা অন্যকে অনেক বেশি ভালবাসে, তাদের পাশে দাঁড়ায় এবং সেবা করে। আজ যে সব কথা আমি এখানে শিখলাম তাতে আমি খুবই আনন্দিত।

* ব্রীমপাটন-এর প্রাক্তন মেয়র সুজান ফেনিল বলেন: আমি জামাত আহমদীয়াতের সঙ্গে বিগত ৩০ বছর থেকে পরিচিত। অনেক অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করেছি যেগুলিতে খলীফাতুল মসীহ উপস্থিত ছিলেন। এটি আমার জন্য সম্মানের কারণ যে আজকে আমাকে এখানে আমন্ত্রিত করা হয়েছে। হুযুরের বার্তা সব সময় শান্তিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারোর তরে' ঘোষণা দিয়ে থাকে। যারা খোদা তা'লার বাণী বোঝেনা বিশেষ করে সেই সকল মানুষদের আমি বলতে চাই যে এটি একটি শান্তির বার্তা। এই বাণীর মধ্যে মানুষ বা কোন জীবজন্তুকে ক্ষতি পৌঁছানোর বিষয় নেই। এটি হল খোদার বাণী এবং এটি আমদের সকলের জন্য।

* রেওরেন্ড রোবর্ট লাইল, নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: আমি আজকের ভাষণে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। এর কারণ ছিল হুযুরের শান্তি, ভালবাসা ও আশার বাণী। এটি এমন এক বার্তা যা ছিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও দেশ নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য। এই ভাষণের গুরুত্ব এখানেও যে, পৃথিবীতে অনেক অপপ্রচার, ভুল তথ্য এবং সন্ত্রাস বিরাজ করছে । কিন্তু আজকের বার্তায় এই এই বিষয়টি স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিসের আধিক্য রয়েছে এবং প্রভেদের বিষয় অনেক কম। এটি একটি বিরাট সুসংবাদ যা মানুষের শোনা উচিত।

*ডক্টর ই.ইয়ান বারক পিসি পার্টি এন্টারিও নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: আমি হুযুর আনোয়ারকে শুভেচ্ছা জানাই। হুযুর-এর ভাষণ আমার কাছে অত্যন্ত প্রভাবসৃষ্টিকারী মনে হয়েছে। তিনি ভালবাসা, ন্যায় ও সুবিচারের বার্তা দিয়েছেন। আমার বাসনা হুযুরের এই বাণী আরও প্রসার লাভ করুক।

* টরেন্টোর একজন শিক্ষক, তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: আমার মতে এটি খুবই আনন্দের বিষয় যে, হুযুর গোটা বিশ্বের জন্য শান্তির বার্তা উপস্থাপন করছেন। এই বাণী কেবল মুসলমানদের জন্যই সীমিত নয় বরং সমস্ত জাতি ও ধর্মের মানুষের জন্য। যদি আমরা পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করি তবে সেই সাপেক্ষে তাঁর এই বার্তা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। তাই আমি মনে করি এই বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল এবং সকলের শোনা উচিত।

* ক্যাথলিক স্কুলের সহকারী প্রিন্সিপাল মাস্মো জুনুবল নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: যখনই এমন শক্তিশালী ভাষণ শোনার সুযোগ হয় আমি তাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করি। খলীফাতুল মসীহর ভাষণে এমন অনেক কথা ছিল যা আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি। তাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

* মহম্মদ আল হুলুওয়াজি, সদর নায়েল এসোসিয়েশন অব এন্টারিয়ো নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: আজকের বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল যে আমাদের সকলকে ভালবাসার সাথে থাকা উচিত। কারোর সঙ্গে আমাদের ঘৃণার প্রয়োজন নেই। যদি আমরা একে অপরকে ঘৃণা করতে থাকি তবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যখন আমি পার্লামেন্টের মধ্যে হুযুর আনোয়ার-কে ভাষণ দিতে শুনি তখন আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, একজন মুসলমান নেতা এইভাবে পার্লামেন্টের মধ্যে ভাষণ দিতে পারে। হুযুর-এর মধ্যে ভীতির কোন ছাপ ছিল না, তিনি অত্যন্ত নির্ভীকতার সঙ্গে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং মানুষ বিশ্বাস করে নেয় যে, এটিই হল ইসলামের সঠিক ও সত্য বাণী। তিনি বলেন, যে সব যুদ্ধ হচ্ছে সেগুলির পিছনে মুষ্টিমেয় মানুষ রয়েছে যারা এর থেকে ফায়দা লুটছে। আজকের ভাষণে হুযুর 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো তরে'-এর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন যে: এটি আমাদের সকলের কর্মসূচি হওয়া উচিত এবং এটিই সত্য। আমি ১৯৮০ সাল থেকে আহমদী মুসলমান, কিন্তু বিগত ১০/১৫ বছর থেকে আমি জামাত থেকে দূরে সরে গেছি। এখন আমার মনে হয় যে, উলেমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাখা উচিত।

সান্টা আলুয়ী, ইউগেন্ডা মাদার চার্চ, তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: খলীফাতুল মসীহর আজকের বার্তা ছিল ক্ষমাপরায়ণতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে। বিশেষ করে তাঁর বার্তা ছিল এই যে, সমস্ত ধর্ম এক-অদ্বিতীয় খোদাকে মান্য করে, কিন্তু তারা বিভিন্ন নামে তাঁকে স্মরণ করে থাকে। হুযুর বিশেষ করে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, তোমাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বেশি চেষ্টা করা উচিত। এই কথা শুনে আমি অনেক আনন্দিত হয়েছি।

*সুরন্দর সিধু নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, হুযুর-এর ভাষণের কারণে এটি একটি দারুণ উপলক্ষ্য ছিল। হুযুর নিজের ভাষণে শান্তি, ভালবাসা এবং সমগ্র পৃথিবীরে উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিষয়ে বলেছেন।

* ফিডল নামে একজন ছাত্র নিজের অভিব্যক্তি বর্ণনা করে বলেন: গোটা অনুষ্ঠানটি, হুযুর-এর ভাষণ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের এবং হৃদয়গ্রাহী ছিল। হুযুর-এর সাক্ষাতের বিষয়টি বর্ণনা করার জন্য আমার কাছে ভাষা নেই। এটি আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল।

* ফিরিশতা নামে একজন শিয়া মুসলিম ছাত্র নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন: ইসলাম ও শান্তি সম্পর্কে হুযুরের ভাষণ আমার চিন্তাধারার ঠিক অনুরূপ ছিল। হুযুর-এর চেহারায় যে জ্যোতির আভা প্রকাশ পাচ্ছিল তা অত্যন্ত আকর্ষনীয় ছিল।

* গ্যারিথ কালভে এবং ডিনা কালভে নিজেদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন: অত্যন্ত উপযোগী বার্তা ছিল এবং প্রত্যহ পৃথিবীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তৃপ্তিদায়ক পরিবর্তন ছিল।

* বারাকাথ নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন: হুযুরের বক্তব্য অত্যন্ত প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল এবং এটি সমগ্র বিশ্বের জন্য। আমার ইচ্ছা, এই বার্তা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে যাক।

*লুসী কারানোল, পাবলিক রিলেশন গাইনিস এবং ক্যারিবিয়ান কমিউনিটি, তিনি নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ থেকে আমি এমন অনেক কথা শিখেছি যেগুলি আমি জানতাম না। তিনি আমাদেরকে নিজের ভাষণে একথাও শিখিয়েছেন যে, আমরা কিভাবে একে অপরকে ভালবাসতে পারি। তিনি আমাদেরকে একথাও জানিয়েছেন যে, সমগ্র মানবতা এক। তাঁর একটি কথা আমার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে, সেটি হল এই যে, মানুষ হিসেবে কোন কোন বিষয়ে আমাদের মধ্যে বিভেদ থাকতে পারে কিন্তু এর সমাধান সূত্র বার করার জন্য আমাদের চেষ্টা থাকা উচিত। সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদের কথা বুঝতে হবে এরপর আমরা ন্যায় বিচারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে পারি। আরও একটি বিষয় যা আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে যে, যদি আমরা নিজেদের মতানৈক্য ও বিভেদ দূর না করি এবং মিলেমিশে থাকতে না পারি তবে এর পরিণাম ভবিষ্যত প্রজন্ম ভোগ করবে। খোদা তা'লা আমাদেরকে নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিভেদ থাকা সত্বেও মিলেমিশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

* ইয়ার্ক ইউনার্ভিসিটির একজন ছাত্র মি: মেগান নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন: আজ আমি এখানে এসে খুবই আনন্দিত। এটি দেখে খুবই ভাল লাগছে যে, জামাত আহমদীয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে নিকটে নিয়ে আসছে। আমার মতে আজ পৃথিবীর এটিই প্রয়োজন।

* ইতা কমিউনিটির সদস্য আবু বাকার ইউসুফ বলেন: আমি যা কিছু শুনলাম ও দেখলাম তাতে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। হুযুর নিজের বক্তব্যে রসূলুল্লাহ (সা.)-এ অনেক উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সেগুলির উপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত। তিনি মহানবী (সা.)-এর আদর্শ থেকে এটিও প্রমাণ করেছেন যে, তিনি (সা.) কখনো কাউকে জোরপূর্বক ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তিনি (সা.) কিভাবে মানবতার সেবা করেছেন সে সম্পর্কে হুযুর বর্ণনা করেছেন। হুযুর কুরআন করীমের শিক্ষার আলোকে বলেন, কুরআন শরীফের আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' অর্থাৎ ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। মহানবী (সা.) কিভাবে খৃষ্টান, ইহুদী ও হিন্দু বা যে কোন ধর্মের অনুসারীদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেছেন এবং তিনি (সা.) সকলকে স্মরণ করিয়েছেন যে, মানুষ হিসেবে আমরা সকলে এক- এ সম্পর্কে হুযুর বর্ণনা করেছেন। হুযুর তাঁর বক্তব্যে দুঃখ ভারাক্রান্ত মানবতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তাদের সহায়তা করা আমাদের কর্তব্য। হুযুর বলেন, জুলুম, অত্যাচার এবং স্বার্থপরতা ত্যাগ করে আমাদেরকে মিলেমিশে থাকতে হবে। মহানবী (সা.) আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন।

*গিনিশ আই.টি.প্রফেশনল বলেন: খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং এই ধরণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে করে আমি আনন্দিত।

*একজন ছাত্র নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন: হুযুর যেমনটি বর্ণনা করেছেন যদি আমাদের সকলের চিন্তাধারাও অনুরূপ হত তবে কতই না উত্তম হত। আমি তাঁর বক্তব্যে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। আমি এই বার্তা নিজের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি এবং এটিকে নিজের জীবনের অংশ করে নেওয়ার চেষ্টা করব।

* কৃশা নামে একজন অতিথি বলেন: আমি যে এখানে এসেছি তা আমার জন্য সম্মান ও গর্বের কারণ। শান্তি বিষয়ক এই বক্তব্যটি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমরা টেলিভিশনে অনেক ভাষণ শুনে থাকি যেগুলি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঘৃণার প্রসার করে। এই কারণে শান্তি ও ভালবাসার এই বাণী শুনে খুবই ভাল লাগল।

*শান্টিল নামে একজন অতিথি বলেন: এখানে এসে আমি খুবই আনন্দিত। আমাকে আপনাদের আমন্ত্রণ জানানো সম্মানের কারণ। আমরা কিভাবে পরস্পর মিলে মিশে থাকতে পারি বক্তব্যে সে বিষয়ের বর্ণনা ছিল। আমি আশা করি, আরও অনেক মানুষ এই বার্তাটি শুনবে।

* অনিতা সামরা নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: খলীফার বক্তব্য শোনা এবং ইসলামী কমিউনিটিকে দেখার এটি একটি অসাধারণ মুহূর্ত ছিল। আমার কাছে এটি অত্যন্ত আনন্দের কারণ। হুযুরের অটোগ্রাফ নেওয়ারও আমার সুযোগ হয়েছে।

*একজন ডিজাইনার নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: হুযুরের বক্তব্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আমি এর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ও আনন্দিত হয়েছি। খলীফার মধ্যে এক প্রকার প্রতাপ আছে। আমি যখন তাঁর কাছে পৌঁছি নিজের মধ্যে এক প্রকম্পন অনুভব করি। তাই নিশ্চয় তাঁর মধ্যে কোন (পবিত্র) শক্তি বিরাজ করছে। হুযুর একজন বিনয়ী পুরুষ। এই বিনয় প্রত্যেক মানুষ অনুভব করতে পারে।

* ইউগেন্ডার মিটারস চার্চের মেম্বার ফ্রান্সিস আতাও নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন: আমরা কিভাবে নিজেদের জীবনে ' ভালবাসা সকলের তরে' -এই বাণীকে বাস্তবায়িত করতে পারি সে সম্পর্কে খলীফা আমাদের বলেছেন। তিনি স্বয়ং নিজের কর্ম দ্বারা দেখিয়েছেন যে, কিভাবে এর উপর অনুশীলন করা যায়। তিনি ইসলামী শিক্ষার উপর আলোকপাত করেছেন যার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সেগুলি মিথ্যা এবং যেগুলি খলীফা বর্ণনা করেছেন সেগুলি সত্য। প্রকৃত মুসলমান অপরকেও নিরাপত্তা প্রদান করে।

* ওন্টারিও-এর পিসি ইয়ুথ এসোসিয়েশন-এর জ্যাকগ্রীন বার্গ নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ আবেগময় ছিল যা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি নিজের ভাষণে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমার মতে খলীফা কেবল মাত্র আহমদীদের জন্যই নয় বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই একটি জোরালো কণ্ঠ। আমরা আরও একটি বিশ্ব-যুদ্ধ সহন করার ক্ষমতা রাখি না, জাতিসমূহকে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে এবং নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে- খলীফার এই কথা আমাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে।

* পেয়ারা সিং কাদোওয়াল একজন লেখক, তিনি নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: হুযুর যা কিছু বলেছেন তা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত জরুরী। আমরা যদি এই সমস্ত উপদেশাবলীর অর্ধেকও পালন করতে সক্ষম হই তবে আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তি জীবন উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। যে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়ে চলেছে সেগুলির অবসান ঘটবে। আমি আজকের ভাষণে যারপরনায় প্রভাবিত হয়েছি।

* রিয়াল ইস্টেটের পিটরস ওয়ারন্টস বলেন: আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাইছিলাম। হুযুর আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছেন। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি।

* হরজ্যোত নামে একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আমার খুব ভাল লেগেছে। 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এই বাণীটি খুবই সুন্দর ছিল।

[বদর পত্রিকা (উর্দু), ১৯ শে জানুয়ারী, ২০১৭]

প্রথম খুতবার শেষাংশ....

'আমরা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিব।' তখন যারা জামা'ত ছেড়ে গিয়েছিল তারা বলত যে, আমরা শতকরা পঁচানব্বই ভাগ জামা'ত, কিন্তু এখন তাদের অবস্থা কী হয়েছে? আল্লাহ্ তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাদেরকে সত্যিকার অর্থে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। খাজা কামালুদ্দিন সাহেব তার ইন্তে কালের পূর্বে লিখেছেন, 'মির্যা মাহমুদ আমাদের সম্পর্কে যে ইলহাম ছেপেছিল তা একশত ভাগ পূর্ণতা লাভ করেছে, আমরা সত্যিই টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছি'।"

এরপর তিনি (রা.) বলেন, "সারকথা হল আল্লাহ্ তা'লা বার বার আমার সামনে অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেছেন যে, মুসলেহ মওউদ খোদা তা'লার সত্যের আত্মায় সম্মানিত হবেন। এগুলো খোদার নিদর্শনাবলী যা তিনি আমার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।" এটি তাঁর (রা.)- ভাষ্য, আর ভবিষ্যদ্বাণীর তো বিশদ বিবরণ রয়েছে।

যাইহোক, আগামী দিনগুলোতে জামা'তে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে জলসা হবে, এম.টি.এ-তেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হচ্ছে। জামা'তের সদস্যদের তাতে বেশি বেশি যোগদান করা উচিত, শোনা উচিত, যেন ভবিষ্যদ্বাণীর গভীর জ্ঞান লাভ হয়। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বহু নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে– পঞ্চাশ-পঞ্চান্নটি বা ষাটটি বের করেছেন কেউ কেউ, তিনি (রা.) নিজেও বর্ণনা করেছেন; এসব বৈশিষ্ট্যাবলী যা বর্ণনা করা হয়েছে তা বড় মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে, অর্থাৎ সেই সমস্ত লক্ষণাবলী মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

শিক্ষিকা চায়

নাযারত তালীম সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার অধীনে কাদিয়ানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে খিদমতে ইচ্ছুক মহিলাদের অবগতির জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে যে-

(১) প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরের অধিক এবং ৩৭ বছরের কম হওয়া আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যত নুন্যতম উচ্চমাধ্যমিক এবং সামগ্রিকভাবে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি উচ্চমাধ্যমিকে ৫০ শতাংশের কম নম্বর থাকে তবে এর থেকে উচ্চতর শিক্ষা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর থাকা আবশ্যক। (২) উচ্চমাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত সেমিস্টারে এবং প্রত্যেক বছরের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট এবং এছাড়াও টিচার ট্রেনিং ও অন্যান্য সার্টিফিকেটের এটেস্টেড কপি আবেদন পত্রের সঙ্গে নাযারত দিওয়ানে প্রেরণ করুন। (৩) লিখিত পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ ছাত্রীদেরই ইন্টারভিউ-এর জন্য ডাকা হবে। কেবল সেই সকল প্রত্যাশীদেরকেই শিক্ষিকা হিসেবে নেওয়ার জন্য বিবেচনা করা হবে যারা কেন্দ্রীয় কর্মী ভর্তি কমিটির পক্ষ থেকে নেওয়া ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ হবে। (৪) প্রত্যাশীর ইংরেজি উচ্চ মানের হওয়া আবশ্যিক। (৫) সাপ্তাহিক বদরে ঘোষণার দুই মাস পরে পরীক্ষার দিনক্ষণ সম্পর্কে জানানো হবে। (৬) লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-এ পাস করার পর প্রত্যাশীকে নুর হাসপাতালে মেডিকেল চেক-আপ করানো আবশ্যক। এই চেক-আপ -এ সফলভাবে উত্তীর্ণ প্রত্যাশীরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। (৭) যদি কোন প্রত্যাশীর নির্বাচন হয় তবে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। (৮) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে। (৯) নির্দিষ্ট আবেদন পত্র নাযারাত দিওয়ান থেকে সংগ্রহ করুন। আবেদন পত্র পুরণ হয়ে আসার পরে এবিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

(নাযির দিওয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)
মোবা: ০৯৮১৫৪৩৩৭৬০, অফিস: ০১৮৭২-৫০১১৩০
Email: nazaratdiwanqdn@gmail.com

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 2 Thursday, 23-30th March, 2017 Issue No. 12-13

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

দুইয়ের পাতার পর....

আছে আবার কিছু 'অস্থায়ী'। এই বিভাজন উদ্বেগ ও হতাশার আভ্যন্তরীণ একটি কারণ হিসেবে প্রমাণিত আর এরজন্য আমরা প্রায়শই কয়েকটি দেশকে এই অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর দেখতে পাই।

ইসলাম ধর্ম সকল ক্ষেত্রে নিখাদ ন্যায় প্রতিষ্ঠার ও সাম্যের শিক্ষা দেয়। আমরা পবিত্র কুরআনের ৫ নম্বর সূরার ৩ নম্বর আয়াতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেখতে পাই। এই আয়াতে বলা হয়েছে, ন্যায়ের দাবী সমুন্নত রাখতে হলে এমন লোকদের সাথেও ন্যায্য ও সাম্যের আচরণ করা আবশ্যক যারা ঘৃণ্য ও শত্রুতা প্রদর্শনে সকল সীমা অতিক্রম করে। আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হল, যেখানে যেই তোমাদেরকে কল্যাণ ও পুণ্যের দিকে আহ্বান করে তোমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। আর যে-ই যেক্ষেত্রে পাপ ও অন্যায় করতে তোমাদের পরামর্শ দেয় তোমাদের তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, ইসলাম যে ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে, এর মানদণ্ড কী? পবিত্র কুরআনের ৪ নম্বর সূরার ১৩৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, কাউকে যদি তার নিজের বিরুদ্ধে বা তার পিতামাতার বিরুদ্ধে বা তার সবচেয়ে প্রিয় কারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হয়, ন্যায়-নীতি এবং সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য তার এ কাজ করা উচিত।

নিজেদের অধিকারের নামে শক্তিশালী ও উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলোর প্রাপ্য অধিকার খর্ব করা উচিত নয়, আর দরিদ্র জাতিগুলোর প্রতি অন্যায় আচরণ করা থেকেও তাদের বিরত থাকা উচিত। পক্ষান্তরে, দরিদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোর উচিত, তারা যেন শক্তিশালী বা উন্নত জাতিগুলোর ক্ষতিসাধনের সুযোগ সন্ধান না করে। বরং, উভয় পক্ষেরই ন্যায়-নিষ্ঠার নীতিমালা মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। সত্যিকার অর্থে, এটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তি-সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ন্যায় নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার আরেকটি শর্তের কথা পবিত্র কুরআনের ১৫ নম্বর সূরার ৮৯ আয়াতে বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, কোন পক্ষই যেন অপরের সম্পদ ও বিত্তের প্রতি ঈর্ষার বা লোভাতুর দৃষ্টিতে না তাকায়। একইভাবে, এক দেশের পক্ষ থেকে আরেক দেশকে সহায়তা বা সমর্থন দানের মিথ্যা অজুহাতে তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস বা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে, অন্যের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্রসমূহকে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের নামে তাদেরকে ভারসাম্যহীন ব্যবসায়িক লেনদেন বা চুক্তিতে বাধ্য করা উচিত নয়। একইভাবে, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির বা সহায়তা প্রদানের নামে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পত্তি নিজেদের নিয়ন্ত্রয়ণে আনার ফন্দি আঁটা উচিত নয়। নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ কিভাবে যথাযথ ব্যবহার করতে হয় তা স্বল্প শিক্ষিত সমাজ বা সরকারকে শেখানো উচিত। জাতি এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীকে সেবা ও সাহায্য প্রদান করা। তবে এই ধরণের সেবা জাতীয় বা রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যেন না হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গত ছয় বা সাত দশক ধরে জাতিসংঘ দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এই প্রচেষ্টায় তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ঘাটন করেছে। এত সব প্রচেষ্টা সত্বেও কোন দরিদ্র দেশই উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে উপনীত হতে পারে নি। এর অন্যতম একটি কারণ হল, এসব দরিদ্র দেশের শাসকদের ব্যাপক দুর্নীতি। যদিও দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে, উন্নত দেশগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে এরপরও এসব সরকারের সাথে লেনদেন অব্যাহত রেখেছে। এদের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন, আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং ব্যবসায়িক চুক্তির ধারা অব্যাহত থেকেছে। এর ফলে, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর মাঝে হতাশা এবং অস্থিরতা ক্রমাগতভাবে বেড়েছে যা এসব দেশে বিদ্রোহ ও আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। উন্নয়শীল দেশগুলোর দরিদ্র জনগণ এত বেশী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা কেবল নিজেদের নেতাদের বিরুদ্ধেই ক্ষুব্ধ নয় বরং পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধেও তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ। এমতাবস্থায়, চরমপন্থী দলগুলোর হাত শক্তিশালী হচ্ছে- যারা এই হতাশার সুযোগ নিয়ে এসব হতাশাগ্রস্ত লোককে তাদের দলে ভিড়াতে চেষ্টা করছে এবং তাদের ঘৃণা সর্বস্ব মতবাদের পক্ষে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হচ্ছে। এর চূড়ান্ত পরিণতিতে বিশ্ব শান্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসলাম আমাদের আমাদের মনোযোগ শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় উপকরণের প্রতি আকর্ষণ করে। এজন্য চায় অকৃত্রিম ন্যায়পরায়ণতা। এর জন্য সবসময় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা অপরিহর্য। আমরা যেন অন্য কারও সম্পদের প্রতি লোভের দৃষ্টিতে না তাকাই, এটি হল এর দাবী। উন্নত দেশগুলো তাদের স্বার্থসিদ্ধির সেবার চেতনা ও প্রেরণা নিয়ে অনুন্নত ও দরিদ্র জাতিসমূহের সাহায্য ও সেবা করবে, এটিই এর দাবী। এসব দিক যদি মেনে চলা হয় কেবল তবেই সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

স্মরণ রাখবেন, অন্যায় ও অবিচার বিরাজমান থাকলে কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। অতএব কোন দেশ যদি সকল ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে এবং অন্য আরেক দেশকে আক্রমণ করে ও অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ করায়ত্ত করতে চায়, তাহলে এই নিষ্ঠুরতা থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর অবশ্যই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্ত এ কাজে তাদেরকে সর্বদা ন্যায় নীতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামী শিক্ষানুসারে যে সব পরিস্থিতিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তা সবিস্তারে কুরআনের ৪৯ নম্বর সূরার ১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত আছে। পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়, যখন দুটি জাতি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয় আর বিবাদ যুদ্ধে পর্যবসিত হয়, তখন অন্যান্য সরকারের উচিত তাদেরকে সংলাপ এবং দ্বিপাক্ষিপ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আলোচনার প্রতি জেরালোভাবে আহ্বান জানানো, যেন তারা আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিস্পত্তি করে একটি সন্ধি বা মীমাংসায় উপনীত হতে পারে। তবে যদি কোন এক পক্ষ চুক্তির শর্ত মেনে না নেয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাহলে আগ্রাসীকে থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করা উচিত। আগ্রাসী জাতি যখন পরাজিত হয় এবং সে পারস্পরিক আলোচনায় বসতে সম্মত হয়, তখন সকল পক্ষের এমন একটি মিমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য কাজ করা উচিত যা দীর্ঘমেয়াদী শান্তি এবং মিমাংসার পথ সুগম করবে। কোন জাতিকে শেকলাবদ্ধ করার জন্য তার বিরুদ্ধে কঠোর ও অন্যায় কোন শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। কেননা এর দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল হল অস্থিরতা, যা আরও বীভৎস রূপধারণ করবে এবং বিস্তৃত হবে। পরিণামে ছড়িয়ে পড়বে আরও নৈরাজ্য।

তৃতীয় কোন সরকার যদি বিবদমান দুই পক্ষের মাঝে মিমাংসার চেষ্টা করে, তার উচিত পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করা। আর এই নিরপেক্ষতা তখনও বিদ্যমান থাকতে হবে যখন এক পক্ষ এর বিরুদ্ধাচরণ করে। এমন পরিস্থিতিতেও তৃতীয় পক্ষের কোন প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিত নয় বা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে অথবা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কোন কাজ করা উচিত নয়। সকল পক্ষকে তাদের যথাযথ অধিকার প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। শান্তি প্রক্রিয়ায় যেসব দেশ ন্যায়বিচারের দাবী পূরণের লক্ষ্যে মধ্যস্থতা করে, তাদের উচিত নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা বা অন্যায়ভাবে উভয় দেশের কাছ থেকে অন্যায্য সুযোগ সুবিধা আদায় বা এ লক্ষ্যে অন্যায়ভাবে চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা। অন্যায় হস্তক্ষেপ বা কোন পক্ষের উপর অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়। কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার সুযোগ নেওয়া উচিত নয়। দেশগুলোর বিরুদ্ধে অনাবশ্যক এবং অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত নয়। কেননা এটি একদিকে সঠিকও নয় আবার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নে এটি সহায়ক ভূমিকাও পালন করে না।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমি এ বিষয়গুলো অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। এক কথায়, আমরা যদি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বৃহত্তর স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থকে ত্যাগ করতে হবে এবং এর পরিবর্তে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত গড়তে হবে পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার উপর। অন্যথায়, আপনারা অনেকেই এ বিষয়ে একমত হবেন, অদূর ভবিষ্যতে নতুন নতুন জোট ও ব্লক তৈরী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এভাবে বলা উচিত, এ প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে যার ফলশ্রুতিতে নৈরাজ্য বৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে এটি এক বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের রূপ লাভ করতে পারে। এরকম ধ্বংসযজ্ঞ ও যুদ্ধের কুফল নিশ্চিতভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্টের উচিত, প্রকৃত ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। সে সব মহৎ লক্ষ্যে কাজ করা উচিত যা আমি ইতোমধ্যে বর্ণনা করে এসেছি। এমনটি করলে জগদ্বাসী সবসময় আপনাদের এই মহান প্রচেষ্টাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। আমি দোয়া করি, আমার এই আশা যেন বাস্তব রূপ লাভ করে (আমীন)।

আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir